এখন ডুয়ার্স

১-১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬। ১২ টাকা

উত্তরে কি এবার সত্যিই চ্যালেঞ্জ ?

কালিম্পং জেলা উপহার দিয়ে পাহাড়ে মমতা অভিযান সম্পূর্ণ

গ্রিন টিএমসি বনাম রেড টিএমসি ডুয়ার্সে তৃণমূলের অস্বস্তি

গাজোলডোবা

ডুয়ার্সের বৃহত্তম টুরিস্ট হাবের আজ কাল পরশুর গল্প

ডুয়ার্সের চা-বাগান শ্রমিকদের একমাত্র বাঁচার পথ সমবায়

নতুন দুই ধারাবাহিক

ডুয়ার্স থেকে দিল্লি। লাল চন্দন নীল ছবি

এখন পাক্ষিক

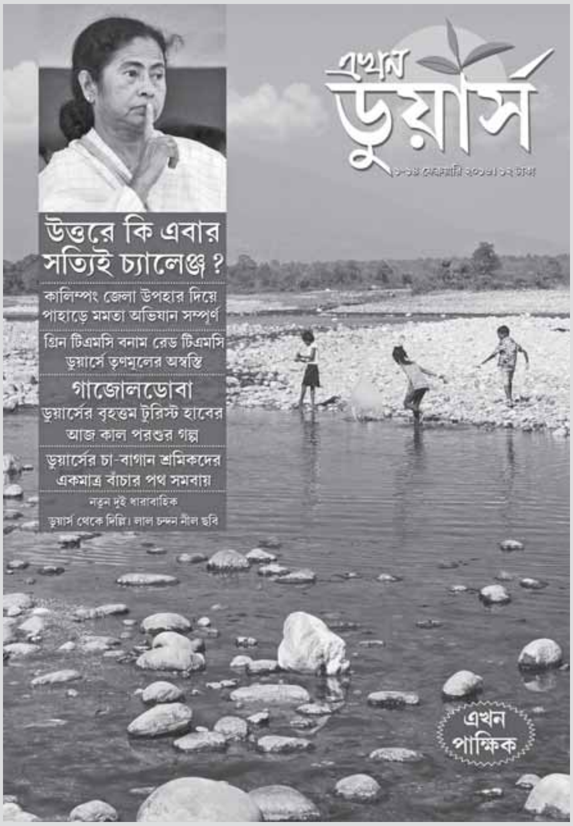

শান্ত নদীর কোল আজ যেন নেই ঠিক
আওয়াজের তান্ডবে প্রতিদিন পিকনিক
বন যেন বন নেই— হোটেলের পার্টি
নদীবুক ধুক্‌পুক্‌ বিচ্ছিরি ডার্টি!

বন্‌বন্‌ বনে যাও রোববারে ফুর্তি
কান চাপে অসহায় ছিপ্‌ছিপে মূর্তি
ভয়ে কাঁপে হলং বা জলঢাকা ডায়না
প্রতিদিন হুল্লোড় আর সওয়া যায় না!

নদীতীর শুধু ভিড় রকমারি রান্না
এঁটোকাঁটা বুকে নিয়ে নদীদের কান্না
মদ আর মাতালের বাড়াবাড়ি চলছে
নদীরাও আজ দেখি টল্‌মল্‌-টলছে!

নীল-নীল কত জল বন ছুঁয়ে আসতো
কত পাখি কত মাছ মন খুলে ভাসতো
আজ দেখি নীলছবি আর পাশে মদ্য
বেলেল্লাপনাতেই আছি অনবদ্য!!

ছন্দে অমিত কুমার দে
ছবিতে ডা. প্রদীপ্ত চক্রবর্তী

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।
এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

দ্বিতীয় বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ১-১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

এই সংখ্যায়

ডাকে ডুয়ার্স
শিলিগুড়ি আর পাহাড়ই আসল চ্যালেঞ্জ! ৪

দূরবিন
হরকাকে কালিম্পং জেলা দিয়ে পাহাড়ে অভিযান সম্পূর্ণ করলেন মমতা ৭

রাজনীতির ডুয়ার্স
ডুয়ার্সে তৃণমূলের অস্বস্তি বাড়াচ্ছে দলে নতুন-পুরনোর লড়াই ১০

এখন ডুয়ার্স
গাজলডোবা ঘুরে আসি! ১৬

চায়ের কাপে চোখের জল
বাঁচতে হলে ডুয়ার্সের চা-বাগান শ্রমিকদের গড়তে হবে সমবায় ১৩
চা-বাগানে খাদ্যের অভাব অবশেষে মন্ত্রীও মানলেন ১৪

পাঠকের ডুয়ার্স
পরিবেশ বিপন্ন করেই কি হবে ডুয়ার্স উন্নয়ন? ২০

নিয়মিত বিভাগ
খুচরো ডুয়ার্স ২৬
ভাঙা আয়নায় টুকরো ডুয়ার্স ২৮
সংঘ সংস্কৃতির ডুয়ার্স ৩৭
বইপত্রের ডুয়ার্স ৩৮
শখের শেখা ৪০
ডাক্তারের ডুয়ার্স ৪৬

ধারাবাহিক ডুয়ার্স
ছিটমহলের ছেঁড়া-কথা ২৪
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি ২২
তরাই উৎরাই ২৯
লাল চন্দন নীল ছবি ৩৩

বিদ্যার্থীর ডুয়ার্স
উচ্চমাধ্যমিকের কিছু মূল্যবান পরামর্শ ৩৯

ডুয়ার্সের গল্প
প্রস্তুতি পর্ব ৩১

পর্যটনের ডুয়ার্স
ঝান্ডিতে মেঘ এসে কানে কানে কথা বলে ৩৬

শ্রীমতী ডুয়ার্স
ত্বকের যত্নে ঘরোয়া টিপস ৪১
তক্কাতক্কি ৪১
মায়ের চোখে ৪২
টেক টক ৪৩
ডুয়ার্সের ডিশ ৪৪
মেঘ পিয়োন ৪৬
সমাজে শ্রীমতী ৪৭
সবলা মেলা মালবাজার ৪৭

সম্পাদক প্রদোষ রঞ্জন সাহা ও অমিত কুমার দে
কার্যনির্বাহী সম্পাদক তপন মল্লিক চৌধুরী
ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
অলংকরণ দেবাশিস রায়চৌধুরী
সার্কুলেশন দেবজ্যোতি কর, দিলীপ বড়ুয়া
বিজ্ঞাপন সেলস সুরজিৎ সাহা
বিপণন দপ্তর বিস্তার মিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড ৮৩/৬ বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-৭০০০১৯, **ইমেল** ekhonduars@yahoo.com
মুদ্রণ অ্যালবাট্রস, **প্রকাশনা** প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সে আমাদের নতুন অফিস
মুক্তা ভবনের দোতলায়। মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি

পুরকর্মযজ্ঞে আজি সবার নিমন্ত্রণ

প্রিয় পুরবাসী,

১৮৯১ সালে জলপাইগুড়ি পুর এলাকায় পথে পথে কেরোসিনের বাতি জ্বালানোর জন্য এক বাতিওয়ালা ছিলেন, যার বেতন ছিল বছরে ৮৪ টাকা। আজ সেই বাতিওয়ালার পদ অতীতের গহ্বরে ইতিহাস রূপে বেঁচে আছে। কিন্তু আমরা সেই কেরোসিন বাতির শহরকে আজ নিয়ে এসেছি আধুনিক আলোকের ঝর্নাধারার নিচে।

শহরের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিতা করলা স্রোত বেয়ে অতীতে একদিন ভেসে যেত ভবানী পাঠকের নৌকো। বৈকুণ্ঠপুর অরণ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশের এই জলপথটি আমাদের শহরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অবিচ্ছেদ্যরূপে। সেই করলাকে আমরা সংস্কার করতে শুরু করেছি। বিশ্ববাংলা ক্রীড়াঙ্গনের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আজ পুরবাসীর মনে যে আনন্দ হয়, তা আমরা জানি। করলা সৌন্দর্যায়ণের প্রতিজ্ঞা নিয়েছে এই পুরসভা।

গান্ধিজী, নেতাজীর পদস্পর্শ ধন্য শহরের পথ সংস্কারের কাজ নিশ্চই চোখে পড়ছে পুরবাসীর। ক্রমবর্ধমান মানুষ আর যান-বাহনের জন্য পথ প্রশস্ত ও উপযুক্ত করতে করতে আমরা অনুভব করছি কর্মের প্রকৃত উচ্ছ্বাস।

এ কর্ম তিস্তা মা-এর জন্য।

এ কর্ম শহরের মাটির জন্য।

এ কর্ম পুরসভার মানুষের জন্য।

বহু কর্মকাণ্ডের সাক্ষি ১৩০ বছর অতিক্রান্ত জলপাইগুড়ি পুরসভার দায়িত্ব নিয়ে আমি আর আমার সহযোদ্ধারা মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরলস অনুপ্রেরণায় চেষ্টা করছি প্রিয় জলপাইগুড়ি শহরকে এমন এক উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ায় যা কি না হয়ে উঠবে একটা দৃষ্টান্তের মতো। শুধু চাই আপনাদের সহযোগিতা।

প্লাস্টিকের নিষিদ্ধ ক্যারিব্যাগ বর্জন করুন।

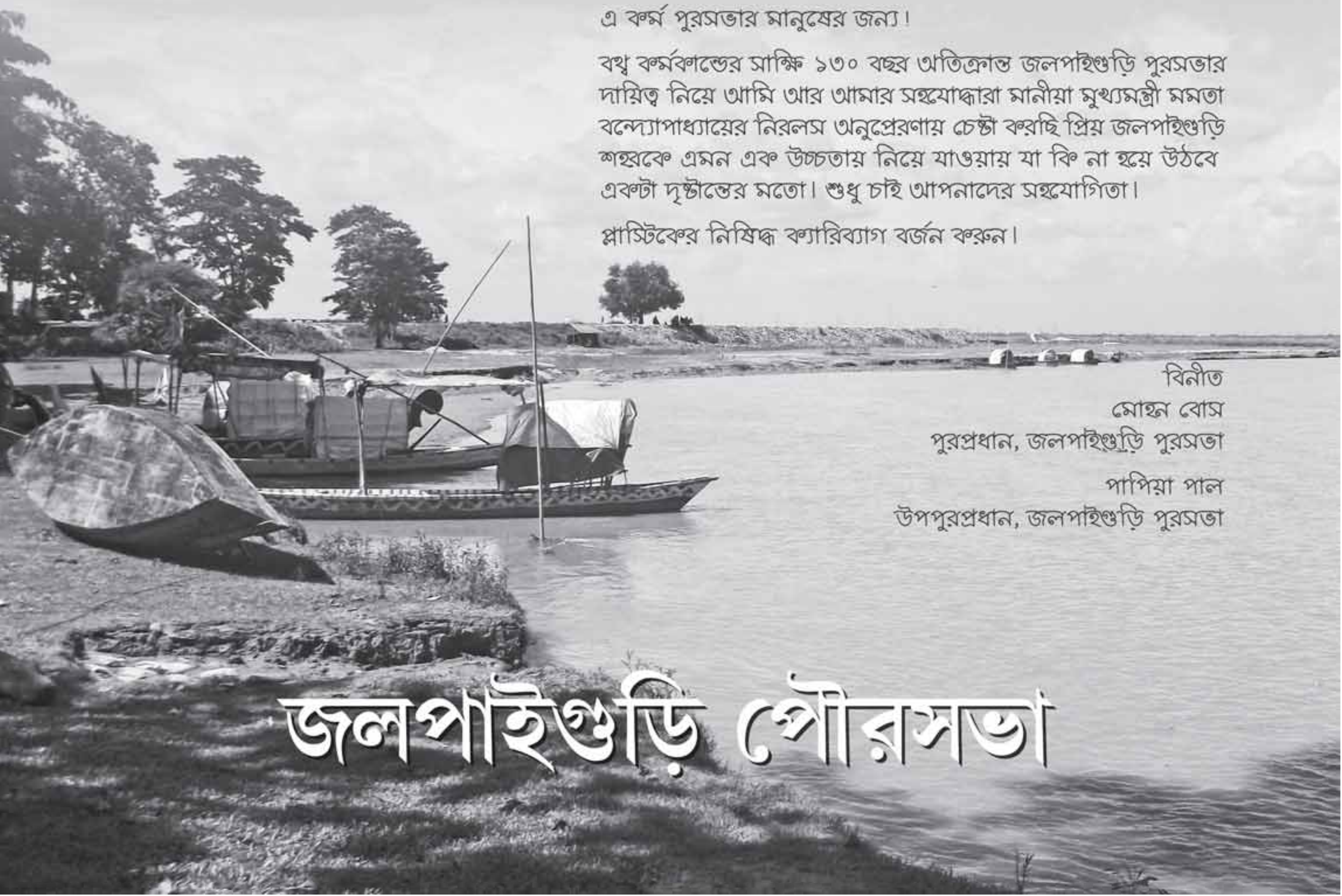

বিনীত
মোহন বোস
পুরপ্রধান, জলপাইগুড়ি পুরসভা

পাপিয়া পাল
উপপুরপ্রধান, জলপাইগুড়ি পুরসভা

জলপাইগুড়ি পৌরসভা

শিলিগুড়ি আর পাহাড়ই আসল চ্যালেঞ্জ !

মুখ্যমন্ত্রী তখনও পাহাড়ে পা রাখেননি। তাঁর আসার ২৪ ঘণ্টা আগেই গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে কার্যত বিধানসভা ভোটের প্রচার শুরু করে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের শীর্ষ নেতৃত্বই দাবি করছে পাহাড়ে তৃণমূল আসা শুধু সময়ের অপেক্ষা। অন্যদিকে, শিলিগুড়িতে বামেদের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতর অভিযান যে আসলে অশোক ভট্টাচার্যের তরফে মুখ্যমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ সেটা বুঝতে রাজনীতি বিশেষজ্ঞ হওয়ার দরকার হয় না। পাহাড় এবার সত্যিই চ্যালেঞ্জ।

পাহাড়ে প্রায় চারদিন কাটালেন মুখ্যমন্ত্রী। মাত্র চার বছরে দার্জিলিং পাহাড়ের জন্য পাঁচটি পৃথক জনজাতি উন্নয়ন বোর্ড গঠন করেছেন তিনি। প্রতিটি বোর্ডকে বছরে গড়ে দশ কোটি টাকা করে দিয়েছেন। সবমিলিয়ে পাঁচটি বোর্ডকে ১৩১ কোটি টাকা। ব্যয় বা বরাদ্দ যাই হোক না কেন তা আসলে বিভাজনের রাজনীতি, মোর্চার ভোট ভাগ করে নিজের পায়ের জমি শক্ত করা।

লেপচা বোর্ড গঠন হওয়ার পর কালিম্পং বিধানসভায় মোর্চার ভোট কমেছে। হরকা দল ছাড়াতে আরও কমবে। দার্জিলিং বিধানসভায় ১৫ শতাংশ লেপচা ছাড়াও মঙ্গর, শেরপা, ভুটিয়া, তামাং সম্প্রদায় বেশ কিছু এলাকায় ভোটে হারজিতের ক্ষেত্রে নির্ণায়ক। দলগতভাবে পাহাড়ে তৃণমূল এখনও শক্তিশালী নয়। দলে এমন কেউও নেই যে সাংগঠনিক ক্ষমতা বাড়াবে। ফলে গুরুঙের ক্ষমতা খর্ব করে পাহাড়ে তৃণমূলের আধিপত্য বিস্তারের জন্য দল সুপ্রিমোর কাছে বিভাজনই একমাত্র পথ।

মুখ্যমন্ত্রী শুকনায় পৌঁছতেই সরগরম শিলিগুড়ি। তা যে ফের শক্তিশালী হয়ে ওঠা অশোক ভট্টাচার্যকে কোণঠাসা করতে সেটা বোঝা যায় শিলিগুড়ি শহর ও লাগোয়া গ্রামাঞ্চলে তিনটি বিধানসভা এলাকায় ২৫ হাজার পড়ুয়াকে সাইকেল বিতরণ করাতে। শিলিগুড়ি বিধানসভা তৃণমূলের দখলে থাকলেও ফাঁসিদেওয়া ও মাটিগাড়া—নকশালবাড়ি রয়েছে কংগ্রেসের দখলে। শিলিগুড়ি বিধানসভা তৃণমূলের দখলে থাকলেও প্রথম পুরভোটে জিতে মেয়র হয়েছেন পরাজিত বাম বিধায়ক অশোক ভট্টাচার্য। পরে তাঁরই নেতৃত্বে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদও দখল করেছে বামেরা। চ্যালেঞ্জ শুধু পাহাড়ে নয়, সমতলেও।

তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী বারবার

WELCOME TO HERITAGE CITY COOCHBEHAR

Suit AC, Super Delux, AC, Non AC , Conference Hall

HOTEL GREEN VIEW

HOTEL Green View

Food & Lodging

Badurbagan Chowpathi, Coochbehar, Contact (03582) 224815/ 229081 (O), 9434756733 (M)

ধূপগুড়ি পুরবাসিদের উন্নত পরিষেবা দিতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ

ধূপগুড়ি পৌরসভা

দীর্ঘকাল উন্নয়ন না হওয়া আর পুর পরিষেবার অবহেলায় ভেঙে পড়েছিল ধূপগুড়ি পুর ব্যবস্থা। এক দিকে অনুন্নয়ন অন্য দিকে সংস্কার না হওয়ার জন্যই মুখ থুবড়ে পড়েছিল ধূপগুড়ি পুর এলাকা। উন্নয়নমূলক কোনও প্রকল্প না থাকায় পথঘাট, নিকাশী, জলাধার থেকে শুরু করে পানীয় জল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সংস্কার হয়নি। বর্তমান পৌরসভা প্রত্যন্ত এলাকার পথঘাট, পানীয় জল, নিকাশী ব্যবস্থা, খাল-বিল-পুকুরসহ জলাশয়গুলির সংস্কার, নতুন করে বাঁধ নির্মাণ, পাকা রাস্তা, ড্রেন ও সেতু তৈরিসহ বহু কাজে উন্নয়নের স্বাক্ষর রাখছে। এখন ওই পুর এলাকায় যে কেউ এসে চোখ রাখলে বুঝতে পারবেন উন্নয়ন আর সংস্কারে কতটা ছোঁয়া লেগেছে ধূপগুড়িতে।

২০১৬তে যেসব প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে—

জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে মায়ের থান থেকে সুকান্ত মহাবিদ্যালয় পর্যন্ত ফালাকাটা রোডের চার কিলোমিটার ওয়েন ওয়ে রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।

দক্ষিণায়ন ক্লাবের দান করা জমিতে ইকো পার্কের কাজ শুরু বছরের শুরুতে। থাকছে বোটিং, টয় ট্রেনসহ নানা বিনোদনমূলক ব্যবস্থা।

শীঘ্রই শুরু হচ্ছে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল সরবরাহের কাজ। চলছে রিজার্ভার তৈরি ও পাইপ লাইন বসানোর কাজ।

উন্নয়নমূলক কাজকর্মের মধ্যে উল্লেখ্য, কুমলাই ও বামনি নদীর উপর আটটি ব্রিজ, রাস্তা চওড়া করা, ১০টি কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ, কুমলাই ড্যাম মেরামত, শ্মশানঘাট মেরামত, নতুন পৌরসভা ভবন নির্মাণ, এরকম আরও অনেক।

পুর নাগরিকদের আরও নতুন পরিষেবা দিতে আমরা বধ্যপরিকর। এখনও অনেক উন্নয়নমূলক কাজের পরিকল্পনা চলছে। খুব শীঘ্রই সেইসব প্রকল্পের কাজ শুরু হবে। আশাকরি ধূপগুড়ি পুর এলাকার মানুষ আমাদের কাজের সহযোগী হবেন।

অরূপ দে
ভাইস চেয়ারম্যান, ধূপগুড়ি পৌরসভা

শৈলেন চন্দ্র রায়
চেয়ারম্যান, ধূপগুড়ি পৌরসভা

সবাইকে নিয়ে চলার বার্তা দিলেও দলের শিলিগুড়ি নেতৃত্বের একাংশ বরাবরই নিজেদের কাছের লোকজনকে নিয়ে চলছেন বলে অভিযোগ উঠছে বারবার। সেই অভিযোগ যেমন ছিল গৌতম দেবের বিরুদ্ধে, তার বদলে নতুন সভাপতি রঞ্জন সরকারের ক্ষেত্রেও ঘটছে। কলকাতা থেকে আসা অরূপ বিশ্বাস যাকে দল সুপ্রিমো পাহাড়ের বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছেন তাঁর ডাকেও জেলার নেতৃত্বের অধিকাংশ থেকেছেন অনুপস্থিত। কারণ সেই কাছের লোক টানাটানির অভিযোগ। তার মানে দেখা যাচ্ছে জেলা সভাপতি বদলের পরও পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়নি। লম্বা উত্তরবঙ্গ সফরকালীন মুখ্যমন্ত্রী শিলিগুড়িতে থাকায় তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠেছিল দলের একাধিক গোষ্ঠী।

অন্যদিকে পাহাড়ে কালিম্পঙের বিধায়ক হরকাবাহাদুর ছেত্রীকে কাছে টানা গেলেও আখেরে তৃণমূলের লাভ কী হল? জনমুক্তি মোর্চার সুপ্রিমো বিমল গুরুং ও তাঁর দলীয় শক্তি কতটা দুর্বল করা গেল? মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরে সেটা মেপে নেওয়া বিধানসভা ভোটের আগে খুব জরুরি ছিল। শিলিগুড়ি সহ দার্জিলিং জেলায় দলের শক্তি কতটা সেটা যাচাই করতেই মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবাংলা ওরফে পাহাড় সফর। তাছাড়া উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন মন্ত্রী গৌতম দেবকে সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে অপেক্ষাকৃত নবীন রঞ্জন সরকারকে দায়িত্ব দিয়ে জেলায় দলের কাঠামোগত যে রদবদল ঘটালেন তা সাংগঠনিক দিক থেকে কোনও সুফল দিতে পারছে কি না সেটাও নিজের চোখে দেখে বুঝে নিতে চেয়েছেন নেত্রী। পাহাড় ও সমতলে বিধানসভা ভোটে প্রার্থীতালিকা চূড়ান্ত করার আগে মুখ্যমন্ত্রীর এই লম্বা সফর তাঁর নিজের কাছে তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রাজ্যের সব দলের আগে যে তৃণমূলই প্রথম দলের প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করবে সে আভাসও তিনি আগেভাগেই দিয়ে রেখেছেন। তাছাড়া ভোটের প্রার্থীতালিকাও চূড়ান্ত করবেন তো তিনিই। সম্ভবত ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে অথবা মার্চের প্রথমে সেই চূড়ান্ত তালিকা ঘোষণা হবে। কিন্তু তার আগে পাহাড়ে দলের অবস্থান এখন ঠিক কোথায় এবং হরকা বাহাদুরের নতুন দলের সঙ্গে জোট বেঁধে কার্শিয়াং, কালিম্পং এবং তিন মহকুমায় বিধানসভা ভোটের লড়াই করলে ফল কী হতে পারে তারও একটা হিসেবনিকেশ করে নিতে হবে তাঁকে। পাহাড়ের অবস্থান জানতে বুঝতে তাঁর ২৪ ঘণ্টা আগে পৌঁছে গিয়েছেন তাঁর আস্থাভাজন তিন শীর্ষনেতা। কিন্তু নেত্রী জেলা নেতাদের আলাদা আলাদা করে ডেকে এনে কথা বলেছেন। যে প্রক্রিয়া তিনি তার আগেই কালীঘাটে নিজের বাড়িতে বসে শুরু করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত দর কে বেশি আর কে কম পাবেন, তাও ঠিক করবেন দল সুপ্রিমো স্বয়ং। কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর আগে সাংগঠনিক শক্তি তথা ভোটের পরিস্থিতি যাচাই করে নেওয়াটা জরুরি। সে কাজ নিজেই করেন দলনেত্রী। এবারও উত্তরবঙ্গ সফরে মুখ্যমন্ত্রী রাই ও লিম্বুদের জন্য আরও দুটি বোর্ড গঠনের কথা ঘোষণা করলেন। তাতেই শেষ নয়, পাহাড়ের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আর্জি মেনে আরও একটি দুটি বোর্ড গঠনের কথা চিন্তাভাবনা করছেন বলেও জানিয়েছেন। বাংলাকে ভাগ হতে না দিলেও পাহাড়ে বহুদিন পাশাপাশি থাকা এই জনজাতিগুলির মধ্যে ভাগ এনেই তো পাহাড়ে নিজের আধিপত্য কায়েম রাখতে হবে!

পরিবর্তনের ভোটে শিলিগুড়ি দখল করেছিল তৃণমূল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দুর্নীতির অভিযোগ ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ক্রমশই ভূমিক্ষয় হয়েছে শাসক দলের। ২০১১ সালের হারের ধাক্কা সামলে পালটা আঘাত হেনেছেন অশোক ভট্টাচার্য। একবার নয়, দু'দুবার। সমতলে যদি গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মিটিয়ে ঘর সামলানোর লড়াই হয়, তাহলে পাহাড়ে তৃণমূলের যুদ্ধ গুরুং-এর শক্তি খর্ব করা। এই দু'ধরনের রণাঙ্গন সামলাতেই তাই কোমর বেঁধে টানা পাঁচদিনের উত্তরবঙ্গ সফর সারতে হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তার আসার আগে শীর্ষনেতারা পৌঁছেছেন ঠিকই কিন্তু নিজের চোখে দেখে জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে সামগ্রিক চেহারাটা যাচাই করে, তবেই না বিধানসভা ভোটের লড়াইয়ের ছক ঠিক ঠিক কষা যাবে।

পৃথক পর্ষদের সুড়সুড়ি দিলেন অধীরও

কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে ভোটের হাওয়া একটু-আধটু অনুভূত হচ্ছে, তবে এই বঙ্গের উত্তরের পরিবেশ এখনও শান্ত-স্নিগ্ধ। শৈত্যপ্রবাহে জুবুথুবু উত্তরবঙ্গের মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক উষ্ণতা ছড়াতে নেতাদের আসা-যাওয়া শুরু হয়েছে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এ রাজ্যে ক্ষয়িষ্ণু শক্তি হলেও এখনও তাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করার মতো নয়। তাই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীর কাছে জোট রাজনীতিও উত্তরবঙ্গ বড় ভরসা। সম্প্রতি কোচবিহার সফরে এসে প্রকাশ্য সভা ও একটি স্থানীয় চ্যানেলে প্রশ্নোত্তর পর্বে যে দাবি করলেন তিনি তাতেও কিন্তু বিচ্ছিন্নতার সুর শোনা গেল। অধীরবাবুকেও শেষ পর্যন্ত বিপজ্জনক রাজনৈতিক তাস খেলতে হল ভোটের রাজনীতি মাথায় রেখে। তিনি জানান, পাহাড়ের বিভিন্ন জনজাতির জন্য পৃথক পৃথক উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করছেন শুধুমাত্র বিমল গুরুংদের বিরুদ্ধাচারণের জন্য। তাঁর পালটা দাবি, উত্তরবঙ্গে প্রায় ৭০ লক্ষ মানুষ আছেন যারা রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত এবং ৫০ লক্ষ নমশুদ্র। তাহলে এদের জন্য কেন পৃথক উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করা হবে না?

কেন্দ্রের বঞ্চনা, বঞ্চিত উত্তরবঙ্গ— এসব শ্লোগান ডুয়ার্সের মানুষের কাছে ওইসব এখন বেশ পুরনো। উত্তরে দুর্যোগ—সেও আজকের নয়। আশির দশক থেকেই পৃথক গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে উত্তপ্ত হিমালয়, আর পাদদেশও কিছু কম নয়। আদিবাসীরাও চান তাদের জমির অধিকার। অন্যদিকে, বৃহত্তর কোচবিহার গঠনের দাবি নিয়ে সরব দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন। তেমনই কামতাপুর রাজ্যের দাবিও নতুন নয়। কেপিপি-র আন্দোলনও দীর্ঘদিনের। সেদিক থেকে বলতে গেলে অবশ্য আগাগোড়াই ডুয়ার্স তরাই পাদদেশও উত্তপ্ত। আলাপ-আলোচনা-চুক্তি-যুক্তি নানা সময়ে নানা ব্যবস্থায় সেই ক্ষততে প্রলেপ দেওয়া হয় রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে।

উত্তপ্ত পাহাড়ের পরিবেশকে শান্ত করতে পরিবর্তনের সরকার নিয়েছিল নতুন কৌশল। বিভিন্ন জনজাতি গোষ্ঠীর বিকাশের কথা বলে একের পর এক পৃথক পৃথক পর্ষদ গঠন শুরু হল। এই পন্থা সেই জনজাতির গোষ্ঠীর কতটা উন্নয়ন ঘটিয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও পৃথক জনজাতি সত্তাকে বড় বেশি প্রকট করে দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠছে। কারণ, তা জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের পরিপন্থী বলে মনে করছেন রাজনৈতিক দলের একাংশ। পাহাড় হাসছে দাবি করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বারবার পাহাড় পরিদর্শনের মধ্যে রাজনৈতিক কৌশল দেখতে পাচ্ছেন তারা। মুখ্যমন্ত্রীর এই নীতির তীব্র সমালোচনা করতে গিয়ে অধীরবাবুর সাম্প্রতিক এই দাবির মধ্যে প্রকারান্তরে মমতার নীতিরই প্রতিধ্বনি শোনা গেছে। যৌক্তিকতা যাই থাক না কেন, বহু জনজাতি গোষ্ঠীর মিলনক্ষেত্র হল উত্তরের জেলাগুলি। হিমালয় ও তার পাদদেশ, বন, বন্যপ্রাণ, ঐতিহাসিক নিদর্শন নিয়ে উত্তরবঙ্গ তার ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে ধরে রেখেছে। জাতের নামে বজ্জাতি করে সেই ঐক্য ও সংহতি যাতে বিনষ্ট না হয় সেদিকেও আমাদের নজর থাকা প্রয়োজন বলে মনে করেন ডুয়ার্সের বিদ্বজ্জন মহল।

পিনাকী মুখোপাধ্যায়

হরকাকে কালিম্পং জেলা উপহার দিয়ে পাহাড়ে অভিযান সম্পূর্ণ করলেন মমতা

বিধানসভা ভোট যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠেনি এখনও। তবে প্রস্তুতিপর্বে যে যার অবস্থানকে দেখে নেওয়া শুরু করেছে। অনেকটা যেন সেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগের মুহূর্ত, যেখানে উভয় পক্ষের সৈন্য সমাবেশের পর একে অপরকে যাচাই করে নেয়। যাতে রণক্ষেত্রের শঙ্খধ্বনি বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যোদ্ধারা নিজেদের তূণ থেকে তির তুলে নিয়ে ধনুকের ছিলায় নিক্ষেপের জন্য স্থাপন করতে পারে। উত্তরবঙ্গের ভোট-রণক্ষেত্রেও সেই সময় আগত। যখন ভোট-যোদ্ধারা একে একে নিজেদের অস্ত্রে তূণ ভরতে চাইছে। বিগত নির্বাচনের আগেও উত্তরবঙ্গ ছিল তৃণমূলের দুর্বলতম জায়গা। মালদা, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহারেও বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেস তুলনামূলকভাবে ভাল ফল দেখাতে পেরেছিল। দার্জিলিং জেলা তার বিশেষ অবস্থানের জন্য বাম, তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক মৃগয়ার বাইরে ছিল। সেখানকার জমিদারির অধিকার অঘোষিতভাবেই সবাই অর্পণ করেছিল আগে সুভাষ ঘিসিঙের জিএনএলএফ-এর হাতে, পরবর্তীকালে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সেনাপতি বিমল গুরুঙের উপর। রাজ্যের নেতারা ধরেই নিয়েছিলেন, দার্জিলিং পাহাড়কে যদি রাজ্যের মধ্যে ধরে রাখতেই হয়, তবে পাহাড়ের যে নেতা নিজেকে সেনাপতি রূপে উপস্থিত করবে, তার কথাকেই শেষ কথা বলে মেনে নিতে হবে। সুভাষ ঘিসিং এক সময় সেই শেষ কথার অধিকারী ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, এমনকি ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি দার্জিলিঙে যাবেন কি না, তাও নির্ধারিত হত সুভাষ ঘিসিঙের ইচ্ছানুসারে। যদিও বা সশস্ত্র রক্ষীবাহিনী পরিবৃত হয়ে তাঁরা সুভাষ ঘিসিঙের অনুমতির তোয়াক্কা না করে দার্জিলিং পাহাড়ে পৌঁছানোর সাহস দেখিয়েছেন তাঁদের খোলা ময়দানে। কিন্তু সে শুধু নিরাপত্তাবাহিনীর সামনে বক্তৃতা। এ ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না তাঁদের।

পরবর্তী আর-এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবুর সামনেও একটা বড় সুবিধা ছিল, কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার বলতে গেলে সম্পূর্ণভাবে বামফ্রন্ট তথা সিপিএমের সমর্থনের উপর টিকে ছিল। তিনি নিজেকে প্রচণ্ড সাহসী মুখ্যমন্ত্রী রূপে উপস্থিত করতে চাইলেও, তাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্বের লাল গাড়ি দার্জিলিং মোড়ে এসে পৌঁছালেও, বামপন্থী স্টিয়ারিংকে কিন্তু তিনিও কখনও বাঁ দিকে ঘোরাবার সাহস দেখাননি। বাঙালি রক্ত দেবে, বাংলা ভাগ হতে দেবে না— দেয়ালে দেয়ালে লিখনগুলি দার্জিলিং মোড় দিয়ে যেখানে পঞ্চাই নদী, সেই ব্রিজের আগেই আতঙ্কে যেন

জমে যেত। তারপর থেকেই তো নামে পশ্চিমবঙ্গ হলেও, গোর্খাল্যান্ডের রক্তচক্ষু দেখে নন্দনের সেই নান্দনিক বীরত্বের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর লাল রক্তচক্ষুর গাড়ি দক্ষিণপন্থী হয়ে শিলিগুড়ির দিকে ঢুকে যেত।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তখনও মুখ্যমন্ত্রী হননি, তখন তিনি রেলমন্ত্রী। বললে অত্যুক্তি হবে না, তিনিই প্রথম সেই ব্যারিকেড ভেঙে উপস্থিত হয়েছিলেন তিস্তার এপারের তরাইয়ের পাহাড় তথা বিমল গুরুংদের রাজত্বের দার্জিলিং পাহাড়ে। শুধু সেখানেই নয়, ডুয়ার্সের মাথার মুকুট আজকের হরকা বাহাদুরের দার্জিলিং জেলার কালিম্পঙেও। হতচকিত হয়ে পড়ে রাজ্যের সরকারি দল সিপিএম। এমনভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দার্জিলিং সফরে প্রকাশ্যে আসাতে ভীতসন্ত্রস্ত সিপিএম দলীয় নেতা থেকে কর্মীরা শিলিগুড়ি শহরের রাস্তায় রাস্তায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দার্জিলিং সফরের বিরুদ্ধে বিশাল বিশাল ব্যানার লাগিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে থাকে। এতে যে হিতে বিপরীত হল তা কিন্তু সিপিএম নেতৃত্ব তাদের আহত অহংবোধের যন্ত্রণায় বুঝে উঠতেই পারল না। আর তাতেই লাভ হল মমতার। যুদ্ধং দেহি বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে বিমল গুরুংরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁদের মিত্র বলে স্বাভাবিক রণকৌশল অনুসারেই মেনে নিলেন।

মানুষ চায় তাদের নেতার দৃঢ়তা ও সাহসী উপস্থিতি। প্রতিপক্ষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার অবস্থানকে দৃপ্ত ভঙ্গিমায় প্রকাশ করার সাহস। কলকাতার নিরাপত্তা বলয়ে বসে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর বাংলা ভাগ হতে না দেওয়ার ঘোষণা আর খোদ দার্জিলিঙের বুকে পৃথক গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের সেনাপতি বিমল গুরুংদের মঞ্চে উঠে গোর্খাল্যান্ড সমর্থকদের জমায়েতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা, 'বাংলাকে ভাগ হতে দেব না।'– এই দুইয়ের মধ্যে যে একটা বিরাট ফারাক রয়েছে তা কিন্তু সমতল ও পাহাড়ের উভয় জনতা বুঝতে পারল। সমতলের জনতা দেখল, তাদের সেনাপতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবল প্রতিপক্ষের সামনেও অবিচল। পাহাড়ের মানুষ এই প্রথম দেখতে পেল, তাদের সামনে এমন এক প্রতিপক্ষ, যে তার লড়াইয়ের আত্মবিশ্বাসে ভরপুর।

প্রশ্নটা এখানেই, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুণগান নয়। বিষয়টা হল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাত্ত্বিক ভাবনায় সিপিএমের প্রাজ্ঞ নেতৃত্ব থেকে অনেক পিছিয়েই শুধু নয়, তাত্ত্বিক বিষয়ে তাঁর পড়াশোনা আছে বলে তাঁর গুণমুগ্ধরাও দাবি করেন বলে শোনা যায়নি। কিন্তু সেই সময়ে দার্জিলিং কিংবা পাহাড়ের রাজনীতির হৃৎস্পন্দন বুঝতে সমর্থ হয়েছিলেন মমতাই। আর একেবারেই পারেননি বুদ্ধদেববাবু। যদিও তিনি মার্কস-স্তালিনের জাতিসত্তার তত্ত্ব দেখতেই অভ্যস্ত, তাহলেও দার্জিলিং পার্বত্য এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে যে সবাই গোর্খা বা নেপালি নন, সেখানে আছে নানা জাতি-গোষ্ঠী তা বুদ্ধবাবুর মেধা-বুদ্ধিতে ধরা না পড়লেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতন এক আঞ্চলিক

নেতার চোখে কিন্তু ধরা পড়তে সময় লাগেনি।

তাঁর সেই দৃষ্টির প্রকাশ ঘটল লেপচা উন্নয়ন পর্ষদ গঠনের মধ্যে। দার্জিলিঙের আদি জনজাতি লেপচারা নেপালি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনস্রোতের চাপে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছে। আর সেই অভিমান তারা মনের মধ্যে পুষে রেখেছে বহুদিন। এই অভিমানকে পুঁজি করলেন মমতা। আর ওটাই পাহাড়ি মানসিকতার ঐক্যকে ভাঙার কাজে ব্যবহার করলেন। দাবিটা ছিল পৃথক গোর্খাল্যান্ড রাজ্য গঠনের। কিন্তু পাহাড়ের সবাই তো গোর্খা বা সাধারণ পরিচয়ে নেপালি নয়। এখানে আছে রাই, ভাষা রাই, মগর, ভাষা মগর, নেওয়ার— ভাষা নেওয়ারি, তামাং— ভাষা তামাঙ্গি, গুরুং— ভাষা গুরুঙ্গি, লিম্ব— ভাষা লিম্বুওয়ানি, লানুয়ার— ভাষা লানুয়ারি, শেরপা— ভাষা ভুটিয়া ও তিব্বতি— ভাষা তিব্বতি, যাখা— ভাষা যাখা। এরা কেউই কিন্তু গোর্খা বা নেপালি বা নেপালিভাষী নয়। পাহাড়ের বাইরের মানুষের কাছে জাতি বা গোষ্ঠীগত এই পার্থক্য চোখে না পড়লেও প্রশাসকদের কাছে তা অজ্ঞাত থাকার কথা নয়। তাই গোর্খাল্যান্ডের ছাতার তলায় একটি রাষ্ট্র গঠিত হলে জাতপাত, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বিভক্ত এই দেশে আজ হোক বা কাল হোক এক জাতি-গোষ্ঠীর অভিভাবকত্বকে মেনে নেবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই সূক্ষ্ম পার্থক্যকে ধরে ফেলে তাকে এই আন্দোলনে বিভেদের অনুরূপে এনে দিতে চেয়েছেন। ইতিহাস বলে, ইংরেজ শাসন এই বিভেদের কৌশলেই একের পর এক দেশ শাসনের জাল প্রসার করেছিলেন। দার্জিলিঙের এই আন্দোলনে লাগাম পরাতেও মমতাকে লাঠি-গুলি চালাতে হয়নি।

এবার তাঁর সূক্ষ্ম কিস্তির সবচেয়ে বড় দাবার চাল হরকা বাহাদুরের দাবিকে মেনে নিয়ে কালিম্পংকে পৃথক জেলা গঠনের ঘোষণা। আর তাঁর ওই দাবিপূরণের মাধ্যমেই তাঁকে তৃণমূলের বৃত্তে টেনে নেওয়া। হরকা বাহাদুর তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন, না পৃথক দল গঠন করছেন, সেই প্রশ্নটা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের অন্যতম শক্তিশালী কেন্দ্র কালিম্পংকে বিমল গুরুংদের হাত থেকে বার করে এনে যে তিনি গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের মর্মস্থলেই আঘাত করলেন— এতে কোনও সন্দেহ নেই। কালিম্পঙের মতো একটা ছোট্ট পাহাড়ি এলাকাকে জেলায় রূপ দিতে হলে ডুয়ার্সের সমতলের বেশ কিছু এলাকাকে যে এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে— এতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে কালিম্পংকে পৃথক জেলার স্বীকৃতি দেওয়ার পর শিলিগুড়িকে পৃথক জেলার দাবি এবার ঠেকিয়ে রাখা যাবে কি না, সেটা একটা প্রশ্ন। পাশাপাশি শিলিগুড়িকে দার্জিলিং পার্বত্য এলাকা থেকে পৃথক করে দার্জিলিঙের মতো সীমান্তবর্তী ও স্পর্শকাতর এলাকা থেকে আরও বিচ্ছিন্ন করে ফেলার পথ প্রশস্ত হয় কি না, সেটাও প্রশ্ন। যদিও ওই বিষয়টি পৃথক আলোচনার দাবি রাখে।

প্রসঙ্গত বলা দরকার, হরকা বাহাদুর নেপালি। আর কালিম্পঙে নেপালি আধিপত্যের বিরুদ্ধে লেপচাদের মনে একটা ক্ষোভ জমা হয়ে রয়েছে। পাহাড়ের জনগোষ্ঠীর মধ্যে লেপচারা শিক্ষায় তুলনামূলকভাবে এগিয়ে আছে। তাদের ছিল নিজস্ব লিপি। নেপালি ও তিরকিদের ব্যাপক অনুপ্রবেশের ফলে তাদের লিপি ও ঐতিহ্য চাপা পড়ে গিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই আহত অভিমানকে ব্যবহার করতেই গঠন করলেন লেপচা উন্নয়ন পর্ষদ।

জাতিগত পরিচয়ে নেপালিভাষী হরকা বাহাদুর এখানে দার্জিলিঙের নেপালি আধিপত্যের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থানকে হাজির করে লেপচা জনজাতির সমর্থন পেতে কালিম্পংকে দার্জিলিং থেকে পৃথক করে পৃথক জেলার ডাক দিয়েছিলেন। হরকা বাহাদুরের একটি স্বচ্ছ মূর্তি পাহাড়ের মানুষের কাছে আছে। তাঁকে কাছে ডেকে নিয়ে তৃণমূলের সংগঠন পাহাড়ে প্রসারিত হবে কি না, সেটা নিশ্চিত নয়, তবে গোর্খাল্যান্ডের রাজ্য গঠনের সেনাপতি বিমল গুরুঙের দলের একটি হাত যে বিচ্ছিন্ন করতে পেরেছেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

সৌমেন নাগ

বহুমুখী কর্মকাণ্ড সফল করতে দায়বদ্ধ কোচবিহার ১ নং পঞ্চায়েত সমিতি

উন্নয়নের পথে মানুষের সাথে— এই স্লোগানকে সঙ্গী করে বাংলার মা-মাটি-মানুষের সরকার চতুর্থ বর্ষ পূরণ করেছে। আমরা কোচবিহার ১নং পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে সমস্ত বাসিন্দাদের অভিনন্দন জানাই।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে জনমুখী পরিষেবাকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে দায়বদ্ধ, কোচবিহার ১নং পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত-পরিবহণ ও কার্য বিভাগ। আমরা বিভিন্ন প্রকল্পের সফল রূপায়নে স্বচেষ্ট। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে কোচবিহার ১নং ব্লকের বৃক্ষরোপণ, সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা এবং পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থার ১০০ দিনের কাজ তরান্বিত করা সহ নিকাশীনালা, পানীয় জল পথ-ঘাট নির্মাণের মধ্য দিয়ে এক নতুন দিশায় পৌঁছতে চাই। উন্নয়নের এই কর্মযজ্ঞে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করি।

ধন্যবাদ সহ—

স্বপন কুমার পাত্র
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
কোচবিহার ১নং ব্লক

খোকন মিঞা
কর্মাধ্যক্ষ, পূর্ত ও পরিবহণ কার্য বিভাগ
কোচবিহার ১ নং পঞ্চায়েত সমিতি।

কোচবিহার ১ নং পঞ্চায়েত সমিতি

ধলুয়াবাড়ি, কোচবিহার

কোনও জোট নয়, ডুয়ার্সে তৃণমূলের অস্বস্তি বাড়াচ্ছে দলে নতুন-পুরনোর লড়াই

রেড টিএমসি বনাম গ্রিন টিএমসি। আদি বনাম পরিযায়ী। আসন্ন নির্বাচনে ক্ষমতার তখ্তে তৃণমূলের প্রত্যাবর্তন নিয়ে এখনও বিরোধীদের গলায় আশাব্যঞ্জক কিছু শোনা না গেলেও ডুয়ার্সে তথা উত্তরবঙ্গে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে নাজেহাল শাসক দলটিকে কিন্তু আসল লড়াই লড়তে হবে দলের অন্দরেই। গত পাঁচ বছর ক্ষমতার বৃত্তের আশপাশে ঘুরতে থাকা বাহিনীর বিরুদ্ধে আদি তৃণমূলীদের এ যুদ্ধ কতটা রক্তক্ষয়ী হবে তা এখনই বলা হয়ত কঠিন, তবে অনেক জায়গাতেই মূল প্রতিদ্বন্দ্বীদের ঝান্ডার রং যে একই হবে, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ অনেকেই।

সাড়ে চার বছরের একটু বেশিই কেটে গেল। বাংলার মানুষ পরিবর্তনের স্বাদ পেয়েছে। ৩৪ বছর এ রাজ্যের মানুষের উপর পাহাড়ের মতো চেপে বসে ছিল বামফ্রন্টের শাসন। সেই শাসনের অবসানেই এসেছে পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের জন্য রাজ্যবাসীর মত ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট — 'সিপিএম, এবার তুমি যাও।' যেভাবেই হোক সিপিএমকে ছুড়ে ফেলাই ছিল এ রাজ্যের আট কোটি মানুষের গরিষ্ঠ অংশের চাহিদা। প্রত্যেকের খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল না,

হিতেন বর্মন

অর্ঘ্য রায়প্রধান

দশরথ তিরকি

হাজি কেতাবুদ্দিন শেখ

উদয়ন গুহ

কেমন হবে পরিবর্তনের চেহারা। তবু মনোভাব ছিল— চাই না প্রমোটার, লুটেরা, ৪২০ মার্কা শিল্পপতি এবং অনিল, রূপচাঁদ, লক্ষ্মণ, সুশান্ত, মজিদদের সিপিএম-কে। তার সঙ্গে ছিল নেতাই, নন্দীগ্রামের সময়ে মুখ্যমন্ত্রিত্বে থাকা মহাকাশচারী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। দেখতে চাই না গৌতম দেব, বিমান বসুদের কিম্ভূতকিমাকার অঙ্গভঙ্গি। এই ছিল এই বঙ্গের আম জনতার মনের কথা। তাই সিপিএমের মরিয়া চেষ্টাতেও দুর্গ রক্ষা হয়নি। হেরে ভূত হয়েছে সিপিএমের লাল দুর্গ— বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর যাদবপুর, গৌতম দেবের দমদম, অশোক ভট্টাচার্যর শিলিগুড়ি, অসীম দাশগুপ্তর খড়দহ, নিরুপম সেনের বর্ধমান। এঁরা সাধারণ মানুষের চোখের বালি হয়ে উঠেছিলেন।

পরিবর্তনের ভোটে মানুষ রায় দিয়েছিল, পাড়ায় পাড়ায় দাদাগিরির বিরুদ্ধে তোলাবাজি, সিন্ডিকেটরাজের বিরুদ্ধে, জঙ্গলমহলে মানুষ খুনের বিরুদ্ধে। আইনশৃঙ্খলার অবনতির বিরুদ্ধে, কাজ না পাওয়ার বিরুদ্ধে, হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা না পাওয়ার বিরুদ্ধে, সামাজিক অস্থিরতার বিরুদ্ধে, জোর করে গরিব মানুষের জমি নেওয়ার বিরুদ্ধে এবং ৩৪ বছরের এক জগদ্দল পাথরের বিরুদ্ধে। পরিবর্তনকামী মানুষের একটাই আশা ছিল, এই দম বন্ধ করা অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারেন একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসই বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে একমাত্র নির্ভরযোগ্য বিকল্প। তাই পরিবর্তন চেয়েছিলেন বঙ্গবাসী।

পরিবর্তন এসেছিল। তার সঙ্গে সুনামির ঢেউয়ের মতো নব শাসকদল তৃণমূলেও পরিবর্তন এল। যে ঢেউয়ের ধাক্কায় দুমড়ে-মুচড়ে গেল শাসকদলের মেরুদণ্ড। পুরনো যাঁরা, তাঁরা ক্ষমতায় আসার আগে যেমন ছিলেন, ক্ষমতায় আসার পরও তেমনই থেকে গেলেন। ক্ষমতার ভাগ থেকে অনেক দূরে। শুধু দলনেত্রী মমতার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ে যাওয়ার স্মৃতি নিয়ে অতৃপ্ত আত্মার মতো তাঁরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সরকারি ক্ষমতা বা কাপ্তেনির সুখভোগ তাঁদের কপালে জোটেনি। এখন সংখ্যায় এঁরাই বেশি। পুরনো এই তৃণমূল কর্মীরা সত্যিই দলটাকে ভালবেসে সিপিএমের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন, নিগৃহীত হয়েছেন, তবু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছেড়ে চলে যাননি। কিন্তু দল ক্ষমতায় আসার পর থেকেই তাঁদের দর কমতে শুরু করেছে।

তৃণমূলের অন্দরে কান পাতলে শোনা যায়, এঁদের নাম 'গ্রিন টিএমসি'। অন্য দিকে, সরকার পরিবর্তনের পর দলকে সর্বগ্রাসী করার বাসনায় একদা 'সেকেন্ড ইন কম্যান্ড' মুকুল রায়ের পরিকল্পনায় জেলায় জেলায় শাসকদলের দখল নিয়েছে নব অভ্যাগতরা। মন্ত্রীসভা থেকে প্রশাসন, দলের প্রতিটি ক্ষমতার অলিন্দে জায়গা করে নিয়েছেন, প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়িয়েছেন হালে আসা নেতারাই। যাঁদের অধিকাংশই বাম-আমলে ক্ষমতা, সুখভোগ করেছেন ষোলো আনার উপর আঠারো আনা। এঁদের প্রায় সবাই ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে তৃণমূলের ডালে পা রাখা শুরু করেছেন। বামফ্রন্টের ভিড়ে ক্ষমতা ভোগ করা এই হাফনেতা ও নেতাদের অনেকেই বুঝেছিলেন, এ কুলে থেকে আর লাভ নেই। অন্য দিকে, দলকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তুলে মমতার কাছে নিজের ভাবমূর্তি বড় করাই ছিল মুকুল রায়ের লক্ষ্য। রতনে রতন চেনার মতো এক পক্ষ

ঠিক যে কায়দায় অনিল বিশ্বাস এক সময়ে সিপিএমের সংগঠন সাজিয়েছিলেন, সেই কায়দাতেই দল সাজিয়েছেন মুকুল রায়। কে কতটা রাজনৈতিকভাবে সচেতন, অনিল বিশ্বাসের জমানায় তা মাপকাঠি ছিল না। ক্ষমতায় টিকে থাকতে কে কতটা প্রয়োজনীয়— এটাই ছিল মাপকাঠি।

আর-এক পক্ষকে চিনে নিয়েছিল। তৃণমূল নেতা-নেত্রীদের ভোটে দাঁড়ানোর খরচ-খরচাও এঁরাই জুগিয়েছিলেন বলে জানা যায়।

আর এইখানেই তৃণমূলের মধ্যে বিষবৃক্ষের চারা পোঁতা হয়ে গিয়েছে। ঠিক যে কায়দায় অনিল বিশ্বাস এক সময়ে সিপিএমের সংগঠন সাজিয়েছিলেন, সেই কায়দাতেই দল সাজিয়েছেন মুকুল রায়। কে কতটা রাজনৈতিকভাবে সচেতন, অনিল বিশ্বাসের জমানায় তা মাপকাঠি ছিল না। ক্ষমতায় টিকে থাকতে কে কতটা প্রয়োজনীয়— এটাই ছিল মাপকাঠি। মুকুল রায়েরও মন্ত্র ছিল তা-ই। মুকুল রায়ের হাত ধরে আসা বাম-জমানায় চাকরবৃত্তি করা সরকারি অফিসার দিব্যি মন্ত্রী হয়ে বসেছেন। কেউ কেউ আবার এমএলএ অথবা জেলায় দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসেছেন। দলের ভিতরে এই গোত্রের নাম হল 'রেড টিএমসি'। পরিবর্তনের পরে তৃণমূলে এই দুই গোষ্ঠীর লড়াই এখন তুঙ্গে।

এই বিষ যে এখন শরীরের উপর দিকে উঠছে তা বিলক্ষণ বুঝেছেন মমতা। তাই কালীঘাটে নিজের বাড়িতে প্রতি সপ্তাহে বৈঠকে জেলার নেতাদের তুলোধোনা করছেন। কিন্তু আক্ষেপ, কাজের কাজ আদৌ কিছু হচ্ছে না। মমতা এখন বুঝতে পারছেন জেলায় জেলায় এই 'রেড টিএমসি' বনাম 'গ্রিন টিএমসি'র লড়াই যত বাড়বে, ততই দলের বিপদ ঘনাবে। এই লড়াইয়ের চেহারাটা বোঝাতে প্রথমেই কোচবিহারের কথায় আসা যাক। উত্তরবঙ্গের এই জেলাতে 'গ্রিন টিএমসি' বনাম 'রেড টিএমসি'র লড়াই এখন তুঙ্গে। যার সূচনা করেন ফরওয়ার্ড ব্লক থেকে তৃণমূলে এসে মন্ত্রী হওয়া হিতেন বর্মন। সঙ্গে প্রয়াত ফ ব সাংসদের পুত্র অর্ঘ্য রায়প্রধান যিনি কোন যাদুতে সাংসদ পদে তৃণমূলের টিকিট পেয়ে লড়াইতে ফেল হওয়ার পরেও ফের বিধায়ক হওয়ার সুযোগ পেলেন, তা কারও অজানা নয়।

আর 'গ্রিন টিএমসি'র নেতৃত্বে রয়েছেন দলের পুরনো নেতা রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। হিতেনবাবু বন মন্ত্রী হওয়ার সুবাদে ক্ষমতা দেখানোর এবং ক্ষমতা বিলানোর সুযোগ পেয়েছিলেন যথেষ্ট। অন্য দিকে, রবীন্দ্রবাবু পেয়েছিলেন ভরতুকি দিয়ে কোনওমতে ঠেলেঠুলে চালানো উত্তরবঙ্গের পরিবহন দপ্তরের ভার। এই সুযোগেই হিতেন বর্মনের সঙ্গে আমদানি হওয়া ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতারা জেলায় তৃণমূল দলেরও দখল নিয়েছেন বহু জায়গাতেই। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে সদ্য শিবির পালটানো ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা উদয়ন গুহর গোষ্ঠী। কোচবিহারে এই নবতম সংযোজন এখন 'গ্রিন টিএমসি' বনাম 'রেড টিএমসি' লড়াইতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তৃণমূলের নিজেদের মধ্যে লড়াই পুরনো কংগ্রেসি কালচারের অঙ্গ। শত্রু নিধনের জন্য এক সময় নিজের দলের পুরনো নেতাদের দূরে হঠিয়ে দিলেও রেড টিএমসি-র দাপটে এখন রীতিমত নাজেহাল জেলা তৃণমূলের মুখ্য সংগঠক রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। উদয়নের দলবল নিয়ে সাম্প্রতিক যোগদান যে তাঁর একচ্ছত্র ময়দানে যথেষ্ট শংকার মেঘ ডেকে এনেছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই রাজনৈতিক মহলের।

একই চিত্র আলিপুরদুয়ার জেলাতেও। দশরথ তিরকি ও কোং তো অনেক পরের সংযোজন, রাজ্যে ক্ষমতা বদলের গন্ধ পেয়ে আরএসপি থেকে পালে পালে আসা ছোট-বড় নেতা ও তাদের বাহিনি। গত পাঁচ বছর ধরে দাপাচ্ছে নতুন জেলার পথ ও প্রান্তর। তাদের দাপটে অতিষ্ঠ খোদ তৃণমূলীরা, ব্যবসায়ী-ঠিকাদারেরা তো আছেই। ভুটান সীমান্তে তৃণমূলের জার্সি গায়ে যারা নানা অবৈধ জমিদারি চালাচ্ছে, তারা এক কালে ছিল উত্তরবাংলার লাল ফৌজের বাহুবল। অপরাধ আর অর্থ যাদের কাছে সমার্থক। তার উপর কংগ্রেস থেকে আসা সৌরভ চক্রবর্তীর ক্রমশ প্রভাব বিস্তারে 'অরিজিনাল' গ্রিন টিএমসি মাঠের বাইরে, যদিও লড়াইয়ের ময়দান ছাড়তে এখনও নারাজ।

জলপাইগুড়ি জেলার চা-বাগান এলাকাতেও দেখা যাচ্ছে চোরা কারবার, নারী পাচার কিংবা বন্ধ হয়ে যাওয়া বাগানের চা-পাতা অবাধে তুলে বেচে দেওয়ার চক্র যারা চালাচ্ছে প্রকাশ্যে দিনেদুপুরে, তারা সবই 'ইমপোর্টেড' তৃণমূলী, এদের ডান্ডার ঘায়ে বা ভয়ে এক সময় গর্তে লুকিয়ে থাকত হাতে গোনা তৃণমূল কর্মীরা, যারা এখনও একই রকম সন্ত্রস্ত। জলপাইগুড়ি ও দুই দিনাজপুর শহর এলাকাতে কংগ্রেস ও তৃণমূলের অবাধে দলের সীমানা পারাপার চলে, তাই রেড টিএমসি-র দাপট তুলনায় কম। আবার তরাই ভূমিতে লাল শক্তি এখনও অনেকটাই সক্রিয় থাকায় চিত্র হয়তো একটু আলাদা। কিন্তু কালিয়াচক থানায় হামলার কথা আমাদের জানা। এর নেপথ্য কাহিনি হল 'গ্রিন টিএমসি' বনাম 'রেড টিএমসি'র লড়াই। কালিয়াচকের সহরুল বিশ্বাস দীর্ঘদিন ধরেই তৃণমূলে আছেন। দল ক্ষমতায় আসার পরে দাদাগিরিতে সুনামও কিনেছেন। তাঁর ভালই চলছিল। কিন্তু গোল বাধল কয়েক মাস আগে। ২০১১ সালে সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএমের প্রার্থী হয়েছিলেন হাজি কেতাবুদ্দিন। ভোটে অবশ্য তিনি হেরে যান। সেই কেতাবুদ্দিন কয়েক মাস আগে তৃণমূলে যোগ দেন। এর পর থেকেই গ্রিন এবং রেড— এই দুই নেতার টক্করে প্রাণ ওষ্ঠাগত কালিয়াচকে বহু গ্রামের বাসিন্দাদের। পরিস্থিতি এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে, দিনের বেলায় দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে বন্ধ রাখতে হচ্ছে স্কুল। সন্ধ্যার পরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দোকানপাট। অন্ধকার নামলে মহিলারা বাড়ির বাইরে পা রাখার সাহস পাচ্ছে না। প্রশাসন সব জেনে-শুনেও নির্বিকার।

ডুয়ার্স তথা উত্তরবঙ্গ জুড়ে কোথাও রেড

ডুয়ার্স তথা উত্তরবঙ্গ জুড়ে কোথাও রেড টিএমসিকে গোপনে হাওয়া দিচ্ছে পুরনো বঞ্চিত তৃণমূলীরা, কোথাও আবার গ্রিন টিএমসি গোপনে ফ ব বা আরএসপি-র সঙ্গে বোঝাপড়ায় যেতে চাইছে, যাতে নির্বাচনে হারিয়ে দেওয়া যায় এই সব সুবিধাবাদী 'মীরজাফরদের'

টিএমসিকে গোপনে হাওয়া দিচ্ছে পুরনো বঞ্চিত তৃণমূলীরা, কোথাও আবার গ্রিন টিএমসি গোপনে ফ ব বা আরএসপি-র সঙ্গে বোঝাপড়ায় যেতে চাইছে, যাতে নির্বাচনে হারিয়ে দেওয়া যায় এই সব সুবিধাবাদী 'মীরজাফরদের'। নির্বাচনের আগে স্পষ্টতই অলিখিত দুই শিবিরে ভাগ হয়ে যাচ্ছে শাসক দল, যার ফল কমবেশি ভোটের বাক্সে পড়তে বাধ্য। একেই উত্তরবঙ্গে বাম ও কং জোট নিয়ে যথেষ্ট চিন্তায় পড়ার ইঙ্গিত পাচ্ছেন রাজনীতির নেতা বা বিশেষজ্ঞরা, তার উপর এই যুযুধান শিবির ডুয়ার্সের রাজনৈতিক ভবিষ্যতবাণী বদলে দিতে পারে।

স্বভাবতই সিঁদুরে মেঘ দেখছেন তৃণমূল প্রধান। তাই বৈঠকের পর বৈঠকে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব রুখতে হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন। কিন্তু বোতল থেকে বেরিয়ে পড়া দৈত্যকে বোতলে ফেরানো যাচ্ছে না। সে কথা বিলক্ষণ বুঝতে পারছেন তিনি। তাই আগামী নির্বাচনের আগে তাঁকে যে আরও অনেকবার আসতে হবে এই ডুয়ার্স ও উত্তরবঙ্গে সে কথা এখনই বলে দেওয়া যায়।

বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য

বদলে যাচ্ছে মালবাজার !

বিগত সংখ্যাগুলোতে মাল বাজারের বদলে যাবার যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা মূলত পরিকাঠামো ভিত্তিক। কারণ পরিকাঠামোর উন্নতি না হলে এলাকার সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। আর তাই মা-মাটি-মানুষের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চেয়েছিলেন চির অবহেলিত ডুয়ার্সের সামগ্রিক ছবিটাকে পালটে দিতে পরিকাঠামোর উন্নয়ন। সেই জন্যই উন্নয়নের বার্তা নিয়ে বারে বারে তিনি ছুটে এসেছেন ডুয়ার্সে। একটু একটু করে বদলাতে শুরু করেছে ডুয়ার্স। বাদ যায়নি মুখ্যমন্ত্রীর প্রিয় শহর মালবাজারও। তারই কিছু চিত্র ধারাবাহিক এই প্রতিবেদনে তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু শুধু মাত্র পরিকাঠামোর উন্নয়ন মানেই তো আর একটা শহরের আমূল বদলে যাওয়া নয়! হ্যাঁ রাস্তা-ঘাট, নালা-নর্দমা, পথবাতি, প্রতীক্ষালয় ইত্যাদির প্রয়োজন আছে বৈকি! কিন্তু এসবের পাশাপাশি একটা শহরকে আধুনিক করে তুলতে চাই খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক বিকাশ। যা এই শহরের অসংখ্য প্রতিভাকে একদিকে যেমন পাপড়ি মেলতে সাহায্য করবে তেমনি যুব সমাজকে সঠিক পথ নির্দেশ দেবে। আর এই কাজে প্রথম থেকেই উৎসাহী স্বপন সাহার নেতৃত্বাধীন মাল পৌরসভা। তাই মাল শহরে অনুষ্ঠিত নাট্য উৎসব, যাত্রা উৎসব বা সাংস্কৃতিক

উন্নত নাগরিক পরিষেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

মালবাজার পৌরসভা

স্বপন সাহা, চেয়ারম্যান, মালবাজার পৌরসভা

অনুষ্ঠানে সমস্ত রকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবার পাশাপাশি খেলাধুলার উন্নতির ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়ে চলেছে মাল পৌরসভা। মাল পৌরসভার উদ্যোগে রেলের মাঠে শুরু হয়েছে ফুটবল অ্যাকাডেমির কাজ। যেখানে নিয়মিত প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন পশ্চিম ডুয়ার্সের নবীন সম্ভাবনাময় ফুটবল প্রতিভারা। এরই সঙ্গে মাল সংস্কার সমিতির সহযোগিতায় পৌরসভার আর্থিক সাহায্যে শুরু হয়েছে টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমির কাজ। পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম সেরা টেবিলটেনিস খেলোয়ার কস্তুরী চক্রবর্তী রয়েছেন প্রশিক্ষকের ভূমিকায়। এছাড়া গত ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষে মাল পৌরসভা মাল মহকুমা ক্রীড়া পর্ষদের সঙ্গে যৌথভাবে রেলের মাঠে স্বামী বিবেকানন্দ নৈশ ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছিল। মাল সংস্কার সমিতির সহযোগিতায় আয়োজিত এই ফুটবল টুর্নামেন্টে স্থানীয় দলগুলোর পাশাপাশি প্রতিবেশি রাজ্য আসাম এবং নেপাল ও আফ্রিকা ইউনাইটেডের মতো বিদেশি দলগুলিও অংশ নিয়েছিল। ক্রিকেটের এই রমরমার যুগেও ফুটবল যে ডুয়ার্সের রক্তে তা এই ফুটবল টুর্নামেন্ট দেখতে আসা অভূতপূর্ব দর্শক সমাগমই বলে দিচ্ছিল! এই টুর্নামেন্টের সাফল্যে উৎসাহিত পৌরসভা আগামীতে এই শহরে উত্তরবঙ্গ কবাডি চ্যাম্পিয়ানশিপের আয়োজনের ব্যাপারেও চিন্তাভাবনা শুরু করেছে। এভাবেই পরিকাঠামোর সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলার উন্নতিতেও এগিয়ে আসা মাল পৌরসভার হাত ধরে ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে আমাদের প্রিয় শহর মালবাজার!

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

বাঁচতে হলে ডুয়ার্সের চা-বাগান শ্রমিকদের গড়তে হবে সমবায়

যারা বলে, চিয়া কো বোটমা সুন ফলছ, আজ তারাই মরছে সোনা ফলানো চা-বাগানে। সংখ্যায় দশ-বিশ নয়, শতাধিক। অনাহারে না অপুষ্টিতে, সে তর্কে কার্যত পরিস্থিতির ভয়াবহতাকে ঠেকানো যায় না। আর চা-বাগিচার শ্রমিক মৃত্যুও নিছক একটি পরিসংখ্যান নয়। ডুয়ার্স তথা উত্তরবাংলা জুড়ে মৃত্যুর অশনিসংকেত। কিন্তু তা নিয়ে যে কেন্দ্র বা রাজ্য কোনও সরকারের সক্রিয়তা বা সদিচ্ছা নেই তা একরকম স্পষ্ট। বন্যার্তদের সাহায্যের মতো বন্ধ চা-বাগানগুলিতে সস্তায় চাল-আটা কমবেশি পৌঁছে দেওয়া রাজ্য সরকারের তরফে চালু আছে। আর সেই জন্যই তারা মৃত্যু প্রসঙ্গে অনাহার বা অপুষ্টি কোনওটাই মানতে নারাজ। সরকার ও তার মন্ত্রীদের অকাট্য যুক্তি এইরকম যে, একজন শ্রমিক চাল-আটা খেয়ে সমৃদ্ধ পুষ্টিগুণ পেতে বাধ্য। বাকি দায় কেন্দ্রীয় সরকারের। খোদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর চা-বাগান বাঁচাতে রাজ্য সরকারের সঙ্গে যৌথতার কথা বলে গিয়েছেন চার-চারটি প্রস্তাব সমেত। কিন্তু সেসব যথানিয়মেই অতীত হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে রয়ে গিয়েছে চা-বাগান অচল হওয়া, বন্ধ হওয়া এবং শ্রমিকের মৃত্যু। কিন্তু কেন্দ্র-রাজ্য দুই তরফেই সেই অবহেলা। সেই উদাসীনতা।

তাহলে ডুয়ার্সের চা-বাগানের শ্রমিকরা বাঁচবেন কীভাবে? এই মুহূর্তে সমবায় গড়ে চা-বাগান চালানো ছাড়া অন্য কোনও পথ বস্তুতপক্ষে শ্রমিকদের সামনে খোলা নেই। সেটা অসম্ভব কিংবা অবাস্তব নয়। তবে কয়েকটি প্রশ্ন প্রকটভাবে না হলেও হাজির হতেই পারে। বন্ধ চা-বাগানের যেমন দেনা থাকে, তেমনই শ্রমিকদের কাছে থাকে বকেয়া। শুধু বন্ধ বা অচল চা-বাগান অধিগ্রহণ করলেই যে সমস্যা মিটবে এমনটা ভাবা বা বলা কখনওই যায় না। রুগ্ণ বাগানকে স্বয়ম্ভর করতে (বিরাট অঙ্কের) বিনিয়োগের প্রয়োজন। হিসাবটা বিরাট অঙ্কের। কেউ কি তাতে কখনও উৎসাহী হয়? অন্য দিকে, সমবায় গঠন করে চা-বাগান পরিচালনা করতেও সমস্যা আছে। তবে সমবায়ের মাধ্যমে চা-বাগান পরিচালনা করা অসম্ভব ব্যাপার— এমনটা একেবারেই ভাবা ঠিক নয়।

সমবায়ের প্রশ্নে প্রথমেই চলে আসে সরকার নিয়ন্ত্রিত সমবায় ল্যাম্পস-এর প্রসঙ্গ। তাকে তো দায়িত্ব দেওয়া যায়। যদি ল্যাম্পসও রাজি না হয় তাহলে চা-বাগানের শ্রমিকদের

মাধ্যমে সমবায় গঠন করে চা-বাগান চালানো যেতেই পারে। প্রশ্ন হল, চা-বাগানের বকেয়া মিটবে কীভাবে? চা-বাগানের লিজ সমবায়ের অনুকূলে অনুমোদন করলে সমবায়ের কাছে তিনজন পাওনাদার থাকবে। প্রথমজন চা-বাগানের মালিক। কারণ, তিনি বাগানের স্থাবর সম্পত্তির মালিক। তাঁর বকেয়া হিসেব করে আদালতের মধ্যস্থতায় কিস্তির মাধ্যমে দেওয়া যেতে পারে। দ্বিতীয়জন চা-বাগানের ঠিকাদার ও অন্যান্য বাইরের মানুষ। এঁদেরও একইভাবে বকেয়া মেটানো যেতে পারে। তৃতীয়জন চা-বাগানের শ্রমিকরা। তাঁদের পাওনা দীর্ঘমেয়াদিভাবে মেটাতে হবে। কিন্তু এসবের জন্য যে খরচখরচা তা জোগাড় হবে কীভাবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, জোগানের রসদ মজুত রয়েছে চা-বাগানেই।

এই মুহূর্তে ডুয়ার্সের সব থেকে বড় চা-বাগানগুলিকেও যদি ধরা যায়, যেমন রেডব্যাঙ্ক, ধরণিপুর কিংবা সুরেন্দ্রনগর, সেখানেও ১,৫৫০ একর মোট আবাদি জমির মধ্যে এখনও ৯০০ একর জমিতে চা-গাছ রয়েছে। যত্ন সহকারে পরিচর্যা করা গেলে প্রতিটি চা-গাছ থেকেই বছরে প্রায় এক কেজি করে চা পাওয়াটা খুব অসম্ভব হবে না। এই হিসেব যদি পুরোপুরি না-ও মেলে, তাহলেও বছরে ৪০ থেকে ৪৫ লক্ষ কেজি চা-পাতা সমবায় তুলতে পারে। তারাই টেন্ডার করে ওই চা-পাতা কোনও বটলিফ ফ্যাক্টরিতে বিক্রি করতেই পারে। কেজিপ্রতি ১০ টাকা করে দাম পাওয়াটাও আজকের বাজারে কঠিন কিছু নয়। তাহলে বছরের হিসেবটা দাঁড়াল কী? গড়পড়তা হিসাবটা দাড়াঁয়— বছরে চা-বাগানের শ্রমিক সমবায় আয় করবে ৪.৫ কোটি টাকা। এই টাকা দিয়েই শ্রমিকদের বেতন

হয়ে যাবে। পরবর্তী কাজ হবে অনাবাদি ফাঁকা জমিকে নতুন করে চাষযোগ্য করে তোলা।

ওই প্রক্রিয়ায় অনাবাদি ৭০০ একর জমিতে তিন বছর আবাদ করাই যায়। নতুন আবাদের খরচাপাতি তুলতে টি বোর্ড ও নাবার্ড-এর কাছে আবেদনও করা যায়। তা ছাড়া হিসাবে ধরতে হবে ডুয়ার্সের সমস্ত বিধায়ক এবং সাংসদকে। শুধু সংখ্যায় নয়, ক্ষমতায়ও তাঁরা বিপুল ও বিশাল। দলমত নির্বিশেষে তাঁরা ফি-বছরে এক লক্ষ করে টাকা দিতে কেন রাজি হবেন না? আর সাংসদরা ২ লক্ষ টাকা করে দিলে কয়েক কোটি টাকার বন্দোবস্ত হয়েই যায়। এটা কি খুব অলীক পরিকল্পনা? আজ জনপ্রতিনিধিরা চা-বাগান নিয়ে শুধু কথাই বলছেন তা তো নয়, বিধানসভা নির্বাচন দরজায় কড়া নাড়ছে। প্রায় সবাইকেই খুব চিন্তিত বলেও মনে হচ্ছে। তাহলে চা-বাগান বাঁচিয়ে মৃত্যুমিছিল আটকাতে আর দেরি কেন? ওই টাকা থেকে হতে পারে কারখানা সংস্কার, তা ছাড়া চা-গাছের পরিচর্যা করাটাও অত্যন্ত জরুরি কাজ।

এবার বাগানের মালিক ও অন্যান্য পাওনাদারদের প্রসঙ্গ। এখানে আদালতের মধ্যস্থতাটা জরুরি। কারণ আদালতের হাত মারফতই কিস্তিতে মেটাতে হবে সেই টাকা। তবে হ্যাঁ, পাঁচ বছরের আগে যে কিছুতেই সম্ভব হবে না সেই বন্দোবস্ত। আদালতের মধ্যস্থতাতেই একমাত্র সম্ভব। পাঁচ বছর পর থেকেই সমবায় তাদের বকেয়া ফেরাতে শুরু করবে। দলমত নির্বিশেষে দলীয় রাজনীতির স্বার্থকে বেশ কিছুটা সরিয়ে রেখেই চা-বাগানের প্রতিটি শ্রমিককে সমবায়ের সদস্য হতে হবে। মাথায় রাখতে হবে, ওএমসি নামক কমিটি গড়ে লুটতরাজের খেলা কিছুতেই করতে দেওয়া যাবে না। বছর পাঁচ-ছয় আগেও ১৮টি চা-বাগান যখন বন্ধ ছিল, তখন প্রতিটি চা-বাগানে ওএমসি তৈরি হয়েছিল। তাতে লুটপাট ছাড়া কিছু হয়নি। সমবায় হলে যে লুটতরাজ চলে না, তার প্রমাণ সোনালি চা-বাগান। তাই আজও তাদের দেড় কোটি টাকা ব্যাঙ্কে রয়েছে। অথচ ওএমসি-গুলির সব টাকাপয়সা বহুদিন আগেই গায়েব।

এই পথে হেঁটেই হান্টাপাড়া চা-বাগানের পাহাড়ভাঙা ডিভিশনে কাজ চালানোর জন্য সমবায় গঠন করা হয়েছে। ৩০ জনের একটি কমিটি গঠন করে প্রত্যেকে পাঁচ হাজার টাকা করে দিয়ে একটি তহবিল তৈরি করা হয়েছে। ওই টাকা দিয়ে বাগানের শীতকালীন পরিচর্যাও শুরু হয়েছে। এতে মার্চ-এপ্রিল মাসে নতুন পাতা তোলা যাবে। যাঁরা কাজ করবেন, তাঁদের ১০০ টাকা করে হাজিরা দেওয়া হবে। গোটা বিষয়ে আইনি জটিলতা মোকাবিলায় তারা সাহায্য চাইছে জেলা পরিষদের। আশা করা যায়, তাঁরা নিরাশ করবেন না।

তপন মল্লিক চৌধুরী

চা-বাগানে খাদ্যের অভাব অবশেষে মন্ত্রীও মানলেন

মৃত্যু মিছিল আমাদের চৌকাঠে হাজির না হলে আমাদের ঘুম ভাঙে না। সে মেদিনীপুরের আমলাশোল হোক কিংবা ডুয়ার্সের চা-বাগান। আমরা খবরই রাখি না কখন হঠাৎ একটা চা-বাগান বন্ধ হয়ে গেল। বড়জোর কয়েক লাইন... বাগানে ক্লোজার নোটিশ... কর্মহীন অতশত... ক্ষোভ-বিক্ষোভ... ট্রেড ইউনিয়ন নেতার একটা কোট, ব্যাস। অথচ অগাস্ট, ২০১৫ সালে 'রাইট টু ফুড অ্যান্ড ওয়ার্ক ক্যাম্পেন ওয়েস্ট বেঙ্গল'-এর প্রতিনিধিরা ডানকানের বাগান ঘুরে প্রতিবেদন তৈরি করেছেন। সেপ্টেম্বরে তা প্রকাশিত হয়েছিল। শিরোনাম ছিল— 'ইগনোরিং হাঙ্গার— রিপোর্ট অন দ্য সিচুয়েশন ইন ডানকান'স টি এস্টেটস ইন নর্থ বেঙ্গল।' না, টনক নড়েনি কারও। নড়লে এত মৃত্যু আমাদের দেখতে হত না। প্রতিবেদনে তখনই সতর্ক করা হয়েছিল, ডানকানের চা-বাগানগুলিতে 'খুব তাড়াতাড়ি অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা ঘটবে।'

অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল ডানকান টি ইন্ডাস্ট্রিতে। বিষয়টা এমন, সংস্থার ১৫টি বাগানে ক্লোজার ঘোষণা করা হয়নি। আবার সব কাজই বন্ধ। বন্ধ মজুরি। ১৪ মাস মাইনে হয়নি, তবু বাগানে রয়ে গিয়েছেন বেশ কিছু কর্মচারী। এই কর্মচারী ও ইউনিয়নের নেতারা মিলে শ্রমিকদের কাঁচা পাতা তোলাচ্ছে। এক কেজি পাতা তুলে তারা পাচ্ছিল চার টাকা। আর কোনও সুযোগ-সুবিধা নয়। যেমন, লঙ্কাপাড়া টি এস্টেটে সেই সময় (অগাস্ট, ২০১৫) ১২২ জন শ্রমিক একদিনে ৬,৭৩৫ কেজি চা-পাতা তুলেছিলেন। তার মাত্র ছ'মাস আগে (২৯ জুন, ২০১৫—৫ জুলাই, ২০১৫) ওই একই শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ছিল ১২২ টাকা। হান্টাপাড়ায় তখন ৩০০-৪০০, বীরপাড়ায় ১৫০, ডুমচিপাড়ায় প্রায় ২৫০-৩০০ এবং নাগাইসুরিতে ৩০০ শ্রমিক এভাবেই কাজ করছিলেন। বাগানের ম্যানেজার বা কর্মচারীরা সেই পাতা ফড়ে বা দালালদের কাছে ১০-১২ টাকা কেজি দরে বিক্রি করত। যতটুকু বাঁচত তা থেকে কর্মচারীদের যতটুকু মাইনে দেওয়া যায়, তা-ই দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু চা-গাছ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোনও খরচ করা হত না। মনে রাখতে হবে, ডানকানের ১৫টি বাগানের মধ্যে অধিকাংশ বাগানেই ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি থেকেই নিয়মিত মজুরি দেওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং নাগাইসুরি ও ডুমচিপাড়াতে মজুরি বন্ধ হয়ে যায় এপ্রিল মাস থেকে। এর সঙ্গে মনে রাখতে হবে, এই যে চা-বাগানগুলির কথা বললাম, এই পাঁচটি চা-বাগানের ১০, ৪০০ শ্রমিকের মধ্যে মাত্র ১,৩০০ শ্রমিক ওই চা-পাতা তোলার কাজ পেয়েছিল।

কী করছিল বাকিরা? নাগাইসুরি ও কিলকটের কর্মহীনরা লরি বোঝাই হয়ে আশপাশের বাগানে কাজ করা শুরু করে। দশ থেকে চোদ্দো ঘণ্টা পরিশ্রম করে মিলত ৯০ থেকে ১০০ টাকা। গাড়ি ভাড়া যেত ১০ থেকে ২৫ টাকা। হান্টাপাড়া, লঙ্কাপাড়া, ডুমচিপাড়ার শ্রমিকরা কাছাকাছি নদীতে পাথর ভাঙার কাজ শুরু করে। ইটভঁটা বা কাছাকাছি বা দূরের নির্মাণশিল্পেও ভিড় বাড়ায় অনেকেই। কিন্তু রোজ তো কাজ মেলে না। পাশাপাশি শুরু হয়ে যায় ভিন রাজ্যে কাজের সন্ধানে চলে যাওয়া। রিপোর্ট বলছে, হান্টাপাড়ার ৩০ শতাংশ কর্মক্ষম তরুণ-তরুণী, লঙ্কাপাড়ার ৪০-৫০ শতাংশ, আর নাগাইসুরির ৬০ শতাংশ পার্মানেন্ট শ্রমিক কেরল, ভুটান, দিল্লি, তামিলনাড়ুতে কাজের সন্ধানে পাড়ি দেয়।

আগস্ট মাসেই পরিস্থিতি সঙিন হয়ে ওঠে। অধিকাংশ পরিবারেই খাবারে টান পড়তে শুরু করে। পাত থেকে ডাল, রান্নার তেল উধাও হতে শুরু করেছে। ডিম, মাংস তো দূরস্থান। ক্যালোরির হিসেবে দেখা যাচ্ছে, ১৮০০ ক্যালোরির নিচে নেমে গিয়েছে, খাদ্যমান কোথাও ১৪০০-র নিচে। চিকিৎসাশাস্ত্রের মতে, অনাহার পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গিয়েছে। বীরপাড়ার সঙ্গীতা ওরাওঁয়ের বাড়িতে সদস্য পাঁচজন। স্বামী-স্ত্রী ও তিন বাচ্চা। বাগান, রুজি বন্ধ হওয়ার আগে তাঁদের খাদ্যতালিকায় ছিল চাল-ডাল-সবজি, রান্নার তেলও আসত। ২৪ অগাস্ট তাঁদের

বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, স্বামী অন্যত্র কাজে চলে গিয়েছেন। ওই দিন দুপুরের খাবারে ছিল এক কেজি চালের ভাত আর বেগুন পোড়া। সন্ধেবেলা কোনও খাবার নেই, রাতেও দাঁতে কাঁটার মতো কিছু ছিল না। ২৫ তারিখ সকালের খাবার নুন-চা। কাস্টি মিঞ্জের বাড়িতেও একই দশা। পাঁচজনের পরিবার এক কেজি চালের ভাত, নুন আর কাঁচা লংকা মেখে খেয়েছে। সন্ধ্যায় অভুক্ত। রাতে ১৫টা রুটি আর আলু সেদ্ধ। পরদিন সকালে আবার অভুক্ত থাকা। ঘরে ঘরে এই পরিস্থিতি। ১২টি বাগানের প্রায় ১১,১৯৬টি পরিবার এবং ৭৪, ১৯০ জন মানুষ গভীর সংকটে (সংখ্যাটি ২০১৩ সালের সরকারের হিসেবমতো ১৫টি ধরলে আরও বাড়বে।) অথচ কোনও হেলদোল নেই কোথাও। সরকার জেনে-বুঝে চুপ। প্রশাসন জেনে-বুঝে চুপ।

কেন বললাম এ কথা? ধরুন সুমিত্রা মুন্ডার কথা। ৪০ বছরের এই মহিলা হান্টাপাড়া চা-বাগানে কাজ করতেন। স্বামী যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে মে মাসে মারা যান। চিকিৎসা হয়নি বললেই চলে। বাগান যখন খোলা ছিল, মাসে তাঁর আয় ছিল ২০০০ টাকা। বাগান বন্ধ হওয়ার পর ১০ বছরের ছেলেকে সিকিম পাঠিয়েছেন জুন মাসে, রোজগার করতে। দিনে একবার খাবার জোগাড় করেন সামনের একটা আইসিডিএস সেন্টার থেকে। যেহেতু তাঁর একটি ছোট্ট শিশু রয়েছে। জানা গেল, ফেব্রুয়ারি ২০১৫ থেকে অগাস্ট পর্যন্ত দু'বার ১২ কেজি করে সরকারি ত্রাণের চাল পেয়েছেন তিনি। একই গল্প হান্টাপাড়ার ৫৭ বছরের ফুলো মুন্ডার। বাগানের সর্বসময়ের শ্রমিক ছিলেন। কাজ নেই, রোজগার নেই। শরীর দিলে পাথর ভেঙে সপ্তাহে ৭০ টাকা মেলে। এপ্রিল ও মে মাসে তিনি ১২ কেজি সরকারি ত্রাণের চাল পেয়েছিলেন।

অর্থাৎ সরকার জানত, প্রশাসন জানত, সামান্য হলেও সরকারি ত্রাণ দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু বাগান সম্পূর্ণ খোলার কোনও তৎপরতা দেখা গেল না।

অথচ কী কেন্দ্র, কী রাজ্য, ডানকান কর্তৃপক্ষের সব ধরনের বেআইনি কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত ছিল। তাদের রিপোর্ট বলছে— ১) ডানকানের ১৫টি বাগানের মধ্যে মাত্র ২টির লিজ ২০১৩ সাল অবধি কার্যকর ছিল; ২) ২০১৩ সালে কর্মীদের মাইনে থেকে ২ কোটি টাকারও বেশি পিএফ কাটা হলেও তা জমা দেওয়া হয়নি। সংস্থার দেয় অংশও জমা পড়েনি। ৩) ওই সালে ২০৪৮ জন কর্মীর গ্র্যাচুইটি পুরো বাকি ছিল; ৪) ২০১৩-র হিসেব অনুযায়ী অবসর নিয়েছেন, কাজ থেকে ছাঁটাই হয়েছেন বা মারা গিয়েছেন এমন ২, ২৫৯ শ্রমিকের ৬ কোটি ২৭ লক্ষেরও বেশি টাকার মজুরি ডানকান দেয়নি। ৫) শুধুমাত্র ২০১৩ সালেই সাড়ে বাইশ কোটি টাকার মতো মজুরি বাকি ছিল। শ্রমিক পিছু যা ১২ হাজার টাকার উপর। এখানেই শেষ নয়, ডানকানের কীর্তি রয়েছে আরও। যেমন, কোনও বাগানেই নিয়মিত রেশন না দেওয়া, অন্তত ৪৪ শতাংশ শ্রমিকের বাসস্থানের ব্যবস্থা না করা, অধিকাংশ শ্রমিকের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা না থাকা।

পরিস্থিতির কথা তোলা হয়েছিল রাজ্যের মুখ্য সচিবের কাছেও। আট সেপ্টেম্বর 'স্পেশাল কমিশনার টু দ্য সুপ্রিম কোর্ট অন রাইট টু ফুড' হর্ষ মান্দার তৎকালীন মুখ্য সচিবের কাছে লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন পরিস্থিতির কথা। দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানানো হয়েছিল। সে কথা কানে তোলেনি সরকার। প্রায় ৬০-৭০ জন মানুষের মৃত্যুর পর সরকার বলছে, অনাহারে কারও মৃত্যু হয়নি। অথচ এখন তারাই রেশনের ব্যবস্থা করছে। না খেতে পেয়ে যদি মারাই না যায় বা সরকারি মতে, সকলেই যদি মদ খেয়ে লিভার পচিয়ে মরে, তবে কী প্রয়োজন এখন চা-বাগানে খাদ্যসুরক্ষা যোজনার সুযোগ ঘোষণা করার? ২ টাকা কেজি দরে চাল শুধু ডানকান নয়, ডুয়ার্সের ১৫০টি বাগানে শ্রমিকদের নয়, বাগানের সমস্ত বাসিন্দাকে এই প্রকল্পের আওতায় আনার কথা ঘোষণা করতে হল।

খাদ্য মন্ত্রীর ঘোষণা মতে, 'এখন থেকে পরিবারপিছু মাসিক খাদ্যশস্যের বরাদ্দ হবে ৩৫ কেজি। এতদিন বরাদ্দ ছিল ১২ কেজি। ২ টাকা কেজি দরে শ্রমিক পরিবারগুলি ১৫ কেজি চাল ও ২০ কেজি গম কিনতে পারবে। এর জন্য তাদের মোট খরচ করতে হবে ৭০ টাকা। (এই সময় ২১ জানুয়ারি, ২০১৫)। সরকার জানাচ্ছে, আলিপুরদুয়ারের ৬৪টি চা-বাগানের মধ্যে ৩৯টি রুগ্ণ। ২৫টি বাগানে রেশন দেওয়া হচ্ছে না। সেখানে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সাহায্যে রেশন বিলি করা হবে।

মন্ত্রীর আক্ষেপ, 'বহু চা-বাগান কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনমাফিক খাদ্যশস্য তোলেন না। কিন্তু চা-শ্রমিকের মৃত্যু হলে সংবাদমাধ্যম দায় চাপায় সরকারের উপর।' অর্থাৎ মন্ত্রী মানলেন, খাদ্যদ্রব্যের অভাবে শ্রমিকের মৃত্যু হচ্ছে। অথচ সরকার দায় নেবে না। সে চাপাচ্ছে মালিকের উপর। তবে প্রশ্ন, মালিককে সরকার কেন বাধ্য করবে না? তার বেআইনি কার্যকলাপ কেন দিনের পর দিন মুখ বুজে মেনে নেবে? আর শুধু খাদ্যশস্য দিলে তো হবে না। কাজও তো দিতে হবে। মজুরি যদি না মিলল, তবে নুন, তেল, সবজি, জ্বালানি কোথা থেকে আসবে? অশক্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধা-প্রতিবন্ধীদের কথা কে ভাববে? সর্বোপরি, সামগ্রিকভাবে চা-বাগান নিয়ে সরকার তার নীতি ঘোষণা করুক। আজও ১৫টি বাগান বন্ধ।

দেবাশিস আইচ

এখন ডুয়ার্স প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি- ০৩৫৩-২৫৩১০১৭
শিবমন্দির
অনুপ দাস- ৯৮৩২০২৯৫১৪
জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক- ৯৭৩৩২৪৬৯১৩
হলদিবাড়ি
অমল দাস- ৯৪৩৪৮০৬৩৮৩
মালবাজার
মিনি বুক স্টোর- ০৩৫৬-২২৫৫০১৫
মালবাজার
ভবতোষ রায়চৌধুরী- ৯৮০০৩০৬৫২৭
চালসা
দিলীপ সরকার- ৯৭৭৫৪১৫১৪৪
বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল- ৯৪৩৪৮০৯৫৯০
বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা- ৯৫৯৩৩৫৪১৫২
লাটাগুড়ি
বিশ্বজিৎ রায়- ৯৯৩২৫৪৬৩২০
ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট- ৯৯৩৩১৯০৮৫৮
ধূপগুড়ি
অমিত কুমার দে- ৯৬৪৭৭৮০৭৯২
ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল- ৯৪৩৪৪১২৬৪৯
আলিপুরদুয়ার
দীপক হোড়- ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭
কোচবিহার
জয়ন্ত দাস- ৯৪৩৪২১৭০৮৪
আরতি ঘোষ, কাছাড়ি মোড়
তুফানগঞ্জ
দীপেন্দ্র সাহা- ৮৯৭২০২০৬০০
মাথাভাঙা
বরুন সাহা- ৯৪৩৪৩৩৭৭৬৮
দিনহাটা
আবেদ আলি- ৯৮৩২৩৪৭৪৫১
মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি- ৯৯৩২৯৬৭৯৯১
রায়গঞ্জ
সুরঞ্জন সরকার- ৯৪৩৪৪২৩৫২২

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন
৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক
০৩৩-২২৫২৭৮১৬

গাজলডোবা ঘুরে আসি !

গাজলডোবার পাশে সুইজারল্যান্ড উপমা হিসেবে বসালে মোটেও মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। পরিকল্পনামাফিক সাজিয়েগুছিয়ে নিলে তা ডুয়ার্সের বৃহত্তম হাব হত একথাও ঠিক। কিন্তু জঙ্গল-নদী- জল সব তছনছ হয়ে গেলে গোটা ডুয়ার্সের পরিবেশ জীববৈচিত্র কতটা ধাক্কা খাবে তা মনে হয় ভাবা হয়নি। সুইজারল্যান্ড না ভেবে বরং ডুয়ার্স ভাবলে প্রোজেক্টটা মেগা ফ্লপ শো হত না।

গাজলডোবার গোড়ার কথা

গাজলডোবাতেই ডুয়ার্সের প্রথম চা-বাগান স্থাপিত হয়েছিল। স্থানটি বৈকুণ্ঠপুর অরণ্যের মধ্যে, যাকে 'জঙ্গলমহল' বলা হত। এর খানিকটা পুবে প্রবহমান তিস্তা এবং সে নদী সেভক থেকে সমতলে রওনা দেওয়ার পর গাজলডোবার কাছাকাছি আসার আগেই নিজের মধ্যে টেনে নিয়েছে পাঁচটি নদীকে। ফলে গাজলডোবার কাছে তিস্তায় জলের পরিমাণ অনেকটা বেড়ে গেছে। এই জলরাশি যাতে বাংলাদেশে না চলে যায়, তাই সেখানে বাঁধ তৈরি করা হয়েছে। ব্যারেজে দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জল খালের মধ্যে দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে গাজলডোবা ঘেঁষে, আমবাড়ি হয়ে মহানন্দা ব্যারেজে। তিস্তার উক্ত ব্যারেজই 'গাজলডোবা' নামটিকে পরিচিত করে তুলেছে নিঃসন্দেহে। কারণ বাংলাদেশকে তিস্তার জল দেওয়ার সূত্রে এই নামটি সংবাদমাধ্যমে বারবার উঠে এসেছে।

২০১৪ সালের ২৫ অগাস্ট গাজলডোবা অবশ্য শিরোনামে এসেছিল ভিন্ন কারণে। সে দিন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন যে, গাজলডোবায় টুরিস্ট হাব হতে চলেছে। ব্যারেজের কাছে খাল বরাবর দু'শো একর জমি পছন্দ করা হয়েছিল সেই 'হাব'-এর জন্য। সেটাই হতে যাচ্ছিল ডুয়ার্সের বৃহত্তম টুরিস্ট হাব। শিলিগুড়ি থেকে গাজলডোবা পর্যন্ত রাস্তা, বিদ্যুৎ, নিকাশি ব্যবস্থা অর্থাৎ আবশ্যক পরিকাঠামো রাজ্য সরকারই করে দেবে বলে জানানো হয়। এর পর বিনিয়োগ এসে রিসর্ট, গল্ফ কোর্ট, হ্রদ বানাবে। এক কথায়, দু'শো একর জুড়ে এক জমাটি উদ্যান।

'পুবের সুইটজারল্যান্ড' উপমাটি ডুয়ার্স সম্পর্কে ব্যবহার করতে ভালবাসেন মুখ্যমন্ত্রী এবং উপমাটি আদৌ অন্তঃসারশূন্য নয়। পরিকল্পনামতো সাজিয়ে-গুছিয়ে নিলে ডুয়ার্সকে দৃশ্যগত বিচারে সুইটজারল্যান্ডের সঙ্গে তুলনা করাটা অবাস্তব কিছু নয়। এটা অনেক আগেই করা যেত, কিন্তু ডুয়ার্স নিয়ে ভাবনাচিন্তা এবং তাঁর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্পর্কে অবহিত হওয়ার ইতিহাস মাত্র কয়েক বছরের শিশু। এতদিন কেন হয়নি, সে প্রশ্ন এখানে তুলব না। তবে এটা ঠিক যে, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ভুল কিছু ভাবেননি।

কিন্তু গাজলডোবার টুরিস্ট হাব-এর ঘোষণাটি কিছু পর্যটন ব্যবসায়ীকে উল্লসিত করলেও ডুয়ার্স সম্পর্কে ওয়াকিবহাল মানুষের ভুরু বেশ খানিকটা কুঁচকে গিয়েছিল সে দিন। এমনিতেই তিস্তা ব্যারেজের খাল কাটতে গিয়ে বিপুল পরিমাণ গাছ কাটতে হয়েছিল। একদিকে বৈকুণ্ঠপুর এবং অপর পারে আপেলচাঁদের ফরেস্ট— দু'পাশেই বাস্তুতন্ত্রের উপর বিশাল ধাক্কা মেরেছিল ব্যারেজের নির্মাণ। ব্যারেজ থেকে শুরু করে তিস্তার খালের পাশ দিয়ে যাওয়ার রাস্তাটা যে অতি সুন্দর, সে নিয়ে দ্বিমত নেই। কাজেই তার ঠিক পাশেই দু'শো একরের গল্ফ কোর্ট শোভিত অত্যাধুনিক থাকার জায়গা পর্যটকের কাছে অতি লোভনীয় হবে— এ নিয়েও বিতর্কের অবকাশ নেই এক বিন্দু। কিন্তু ভুরু যাঁদের কুঁচকে ছিল, তাঁদের কারণ ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। ব্যারেজের কাছে, অরণ্য ঘেঁষে থাকা ওই দু'শো একর জমি অতীব 'ইকো সেন্সেটিভ'। সেখানে কিংবা তার কাছাকাছি এলাকায় প্রায় তিনতারা রিসর্ট কিংবা নয়নাভিরাম গল্ফ খেলার মাঠ স্থাপন করার প্রস্তাব বন বিভাগ মেনে নেয় কোন যুক্তিতে?

বস্তুত, পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে, ডুয়ার্সের বৃহত্তম টুরিস্ট হাব আর যেখানেই হোক না কেন, গাজলডোবায় অসম্ভব। কারণ তাঁদের মতে ডুয়ার্সে পর্যটনের অসীম সম্ভাবনার গুরুত্ব উপলব্ধি করার পর থেকে যা শুরু হয়েছে, তার সিংহভাগই 'অরণ্যে নগর' প্রতিষ্ঠার মতো বিপজ্জনক উদ্যোগ। উন্নয়ন অবশ্য কাম্য, কিন্তু উন্নয়নের নামে ডুয়ার্সকে কংক্রিটে মুড়ে ফেলার পরিকল্পনাটি ভয়াবহ রকমের হাস্যকর এবং পরিবেশ বিষয়ে অসীম অজ্ঞানতার প্রতিফলন ছাড়া আর কিছু নয়। গাজলডোবা টুরিস্ট হাব ছিল এর সর্বোচ্চ নমুনা। অথচ বিশেষ কোনও প্রতিবাদ এল না। কারণ, পিপিপি মডেল মেনে সেই 'হাব'-এ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের কাহিনিও বলা হয়েছিল এই সূত্রে।

২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে জানা গেল, সরকার একশো কোটি টাকা খরচ করে পরিকাঠামো বানিয়ে দিয়েছে। টমাস কুকের মতো পর্যটন ব্যবসায়ী সেখানে তিনতারা সুবিধাসম্পন্ন রিসর্ট নির্মাণের জন্য দরপত্রও দিয়ে দিয়েছেন। বছরে গাজলডোবা টুরিস্ট হাব থেকে রাজ্য সরকারের আয় হতে যাচ্ছে চার কোটি টাকার মতো। কিন্তু যে কাহিনিটা বলা হল না তা হল, টুরিস্ট হাব-এর গল্প শুনে ব্যারেজের কাছাকাছি জমির দাম চড়ে গেছে। যাঁরা কিনছেন, তাঁরা ঝড়ের বেগে গাছ কেটে সাফসুতরো করে অপেক্ষায় আছেন 'হাব' নির্মাণের। উক্ত দু'শো একরেও বৃক্ষচ্ছেদন হয়েছে নির্বিচারে। ফলে যে পাখিগুলো ওই এলাকার শোভা বাড়াতে আসত, তারা আসছে না। 'হাব'-এর কাছ এগলে তারা ওই এলাকাই চিরতরে ত্যাগ করে চলে যাবে।

পাশাপাশি, উক্ত সেপ্টেম্বরেই শিলিগুড়ির একটি হোটেলে উত্তরবঙ্গের ব্যবসায়ীদের ডেকে মুখ্যমন্ত্রীর 'স্বপ্নের প্রজেক্ট'-এ বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছিল পর্যটন দপ্তর। মন্ত্রী গৌতম দেব ছিলেন সেখানে। জনা কুড়ি ব্যবসায়ী হাজির ছিলেন। কাউকেই সেই আহ্বানে সাড়া দেওয়ার মতো উৎসাহ প্রকাশ করতে দেখা যায়নি। কেউ কেউ মন্ত্রীর সামনে 'না' বলতে না পারায় নিমরাজি হয়েছিলেন মাত্র। এ সংবাদ অবশ্য মিডিয়ায় সেভাবে আসেনি। ফলে একটা প্রশ্ন অনুচ্চারিত থেকে গিয়েছিল। যে স্বপ্নের 'হাব'-এ হাজার কোটি বিনিয়োগের কথা, সেখানে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের ডেকে পর্যটন দপ্তর বিনিয়োগের জন্য প্রায় কাকুতি-মিনতি করতে বাকি রেখেছিল কেন সে দিন? আদৌ কি কোনও বড় বিনিয়োগকারী এগিয়ে এসেছেন গাজলডোবায় ডুয়ার্সের টুরিস্ট হাব গঠনের জন্য?

টমাস কুক বা বড় কোনও বিনিয়োগকারী নিশ্চয়ই জানতেন যে, গাজলডোবা ব্যারেজ সংলগ্ন ওই দু'শো একর জমিতে টাকা ঢালা আর তিস্তার জলে সে টাকা বিসর্জন দেওয়া সমার্থক হয়ে দাঁড়াতে পারে। কারণ পরিবেশ সংক্রান্ত আইনি আপত্তি ওঠামাত্রই ভেস্তে যেতে পারে গোটা প্রকল্প। ৮৩ একরের গল্ফ খেলার জায়গা, ৪ একরের হ্রদ ও তার কাছে ১৩ একরের রিসর্ট এলাকা, ৬ একরের 'অ্যামিউজমেন্ট পার্ক' ইত্যাদির পাশাপাশি ইয়ুথ হস্টেল, হসপিটালিটি ট্রেনিং সেন্টার এবং আরও আরও বিষয় মিলিয়ে প্রায় একটা শহর গড়ে তোলার মতো উদারতা পরিবেশ আইন হাসিমুখে মেনে নেবে কি না, সে বিষয়ে যে গোড়াতেই সন্দেহ এঁটে বসেছিল বিনিয়োগকারীদের মাথায় তা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায়।

আর সে সন্দেহ যে যথাযথ ছিল তা প্রমাণিত হয়েছে, সম্প্রতি কলকাতার পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত যখন এই টুরিস্ট হাব বাতিল করার দাবিতে জাতীয় গ্রিন ট্রাইব্যুনাল-এ মামলা দায়ের করলেন। এটা হওয়ারই ছিল। বস্তুত, গাজলডোবা টুরিস্ট হাব যে আদতে এক ধরনের 'ইকোলজিক্যাল

উন্নয়ন অবশ্য কাম্য, কিন্তু উন্নয়নের নামে ডুয়ার্সকে কংক্রিটে মুড়ে ফেলার পরিকল্পনাটি ভয়াবহ রকমের হাস্যকর এবং পরিবেশ বিষয়ে অসীম অজ্ঞানতার প্রতিফলন ছাড়া আর কিছু নয়। গাজলডোবা টুরিস্ট হাব ছিল এর সর্বোচ্চ নমুনা। অথচ বিশেষ কোনও প্রতিবাদ এল না। কারণ, পিপিপি মডেল মেনে সেই 'হাব'-এ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের কাহিনিও বলা হয়েছিল এই সূত্রে।

ডিজাস্টার' ঘটাতে যাচ্ছে— এ বিষয়ে গোড়াতেই কথা উঠেছিল। কিন্তু সরকারের বিন্দুমাত্র হেলদোল দেখা যায়নি। সুভাষবাবু কেবল গাজলডোবা হাব নিয়েই আদালতে যাননি। ডুয়ার্সে ১৭টি নদী থেকে বেআইনিভাবে যথেচ্ছ বালি-পাথর তুলে কী পরিমাণ বিপর্যয় ঘটানো হচ্ছে, তা নিয়েও আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ২৬০টি আলোকচিত্র জমা দিয়ে।

ডুয়ার্সের বিভিন্ন অরণ্যে পর্যটকের আনাগোনা দিন দিন বাড়তে থাকলেও এই জঙ্গলমহলে বিশেষ পা পড়েনি তাঁদের। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের 'হাব' যে ওই অরণ্যের বহু যুগের নিস্তব্ধতা ও বাস্তুশান্তিকে তছনছ করে দেওয়ার নামান্তর— এই সাধারণ বোধ রাজ্যের বন কিংবা পরিবেশ দপ্তরের মধ্যে না পেয়ে সুভাষ দত্তর মতো আরও অনেক পরিবেশসচেতন ব্যক্তি বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এমনিতেই ডুয়ার্সে বহু জায়গায় পর্যটনের নামে পরিবেশকে কলা দেখানো হয়েছে, কিন্তু গাজলডোবায় ব্যাপারটা হয়েছে 'স্রেফ বাড়াবাড়ি'। বন দপ্তরের কর্তারা যে বিষয়টা বোঝেননি তা নয়। কিন্তু প্রস্তাবক যখন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী, তখন কে-ই বা নিজের ঘাড়ে একাধিক মাথার অস্তিত্ব টের পাবেন?

আসলে ডুয়ার্সে কর্মসংস্থান কিংবা ডুয়ার্সের অর্থকরী উন্নতির গল্পটি এর সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া আছে বলে রাজনৈতিকভাবেও বিরোধিতা চোখে পড়েনি এই 'হাব'-কে নিয়ে। বন্ধ হয়ে যাওয়া মানেই তো অনেক ব্যক্তির কাজ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হওয়া। চারতারা মার্কা রিসর্ট আর আয়ুর্বেদিক স্পা-এর গল্পের পাশে এলিফেন্ট সাফারি আর বোটিং-এর রোমান্টিকতা, সঙ্গে দেশি-বিদেশি উচ্চবিত্ত পর্যটকের আগমনের সুখস্বপ্ন জড়িয়ে থাকে এসব 'হাব'-এর ভাবে। বহু বহুকাল ধরে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সামনে অকস্মাৎ এমন প্রস্তাব এলে অরণ্য বাঁচল না মরল, বাস্তুতন্ত্র টিকল না চুরমার হয়ে গেল, তা নিয়ে ভাবার অবকাশ থাকে না। চরম ক্ষুধার্ত ব্যক্তির সামনে দেখতে সুন্দর খাদ্য তুলে দিলে সে খাদ্য বিষ কি না, তা সে ব্যক্তি না-ও ভাবতে পারেন। এমনিতেই ডুয়ার্সে অরণ্যের ঘনত্ব ক্রমশ কমে যাচ্ছে। রেল লাইন স্থাপন আর চা-বাগান পত্তনকে কেন্দ্র করে যে সুপ্রাচীন অনাঘ্রাত অরণ্যের উপর আঘাত আসা শুরু হয়েছিল, তা এই ২০১৬ সালেও কেন অব্যাহত— এর কারণ ডুয়ার্সের মানুষ জানে না। সেখানে আম জনতা ধরেই নিয়েছে যে অরণ্য ধ্বংসের জন্য। উন্নয়নের জন্য ধ্বংস করলে ক্ষতি কোথায়?

শাসক খেলে দেয় ঠিক এইখানটাতেই।

গোড়াতেই বলেছি যে, মুখ্যমন্ত্রী কথিত 'পুবের সুইটজারল্যান্ড' উপমার সারবত্তা আছে। ডুয়ার্স ভূখণ্ডকে উপযুক্ত পরিকল্পনার সাহায্যে উক্ত উপমার উপযোগী করে তোলাটা অবশ্যই বাস্তব। শিমুলগুড়ি বা ললিতাবাড়ি এলাকায় রিসর্ট স্থাপন করে সেখান থেকে গাজলডোবা অবধি ভ্রমণের ব্যবস্থা করা যেত। উলটো দিকে শিলিগুড়ি ও চল্লিশ-পঞ্চাশ মিনিটের রাস্তা বড়জোর। গল্ফ খেলার জায়গা হয় তো পাওয়া যেত না, কিন্তু পরিবেশ বাঁচিয়ে একটা 'বাস্তব' কিছু করে ফেলা যেত। আরও উপযোগী হত রিসর্টের বদলে 'হোমস্টে' ভাবনায় জোর দিলে। গাজলডোবা ব্যারেজের কাছাকাছি, তিস্তার দুই পাড়ে ছড়িয়ে থাকা ছোট ছোট গ্রামে হোমস্টে পর্যটনে উৎসাহ দিলে স্থানীয় অর্থনীতি প্রাণ পেত এমনিতেই।

তাহলে হয়ত দু'শো একর (ঠিকঠাক বললে দু'শো দশ) ভূমি বৃক্ষহীন ধু ধু হয়ে পড়ে থাকত না তিস্তা-মহানন্দা লিঙ্ক ক্যানেল বরাবর। বস্তুত, গাজলডোবায় দু'শো একরের অত্যাধুনিক টুরিস্ট হাব-এ গল্ফ খেলার উত্তেজনাটা হয়ত দারুণ, কিন্তু পরিকল্পনাটার সঙ্গে কোথায় জানি বৃত্তাকার চতুর্ভুজের মিল আছে। দু'শো একরের মেগা প্রজেক্ট দু'শো একরের মেগা ফ্লপ শো হতে চলেছে। কারণ সুভাষবাবুর ঝুলিতে অস্ত্রের অভাব নেই আর তার অধিকাংশই অতি বাস্তব যুক্তি, যার মূল সুর সেই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা, যেখানে বলা হয় যে, ডুয়ার্সের উন্নতি তার বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস করেই সম্ভব।

গোটা দিন গাজলডোবায়

গাজলডোবায় গেলে কিন্তু টের পাবেন যে, মুখ্যমন্ত্রী ডুয়ার্সের বৃহত্তম টুরিস্ট হাব নিয়ে বেশ সিরিয়াস ছিলেন। সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল জল, বিদ্যুৎ আর রাস্তা বানিয়ে দেওয়ার। জমির পশ্চিম প্রান্তে, জঙ্গলমহলের গা ঘেঁষে বিদ্যুৎ সংগ্রহের জন্য সাবস্টেশনের কাজ যে গতিবেগে শুরু হয়ে শেষ হয়ে গেছে, তাতে স্থানীয় মানুষ টের পেয়েছেন, চাইলে সরকারের 'স্পিড' কেমন হয়! জলাধার নির্মাণ

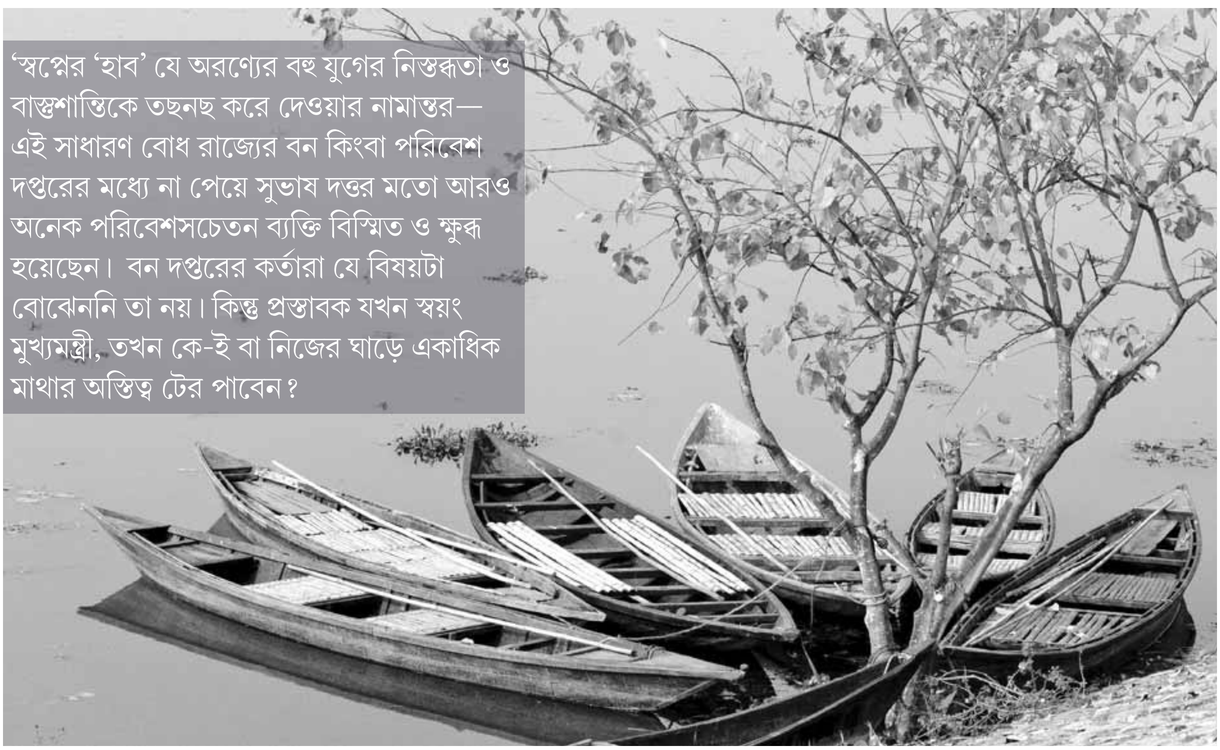

'স্বপ্নের 'হাব' যে অরণ্যের বহু যুগের নিস্তব্ধতা ও বাস্তুশান্তিকে তছনছ করে দেওয়ার নামান্তর— এই সাধারণ বোধ রাজ্যের বন কিংবা পরিবেশ দপ্তরের মধ্যে না পেয়ে সুভাষ দত্তর মতো আরও অনেক পরিবেশসচেতন ব্যক্তি বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন। বন দপ্তরের কর্তারা যে বিষয়টা বোঝেননি তা নয়। কিন্তু প্রস্তাবক যখন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী, তখন কে-ই বা নিজের ঘাড়ে একাধিক মাথার অস্তিত্ব টের পাবেন?

এবং বিদ্যুতের খুঁটি বসানো হয়ে গেছে। বাকি ‘হাব’-এ ঢোকার দুটো রাস্তা। সে চাইলে এক মাসেই নামিয়ে দেওয়া সম্ভব। অর্থাৎ সরকার যা করে দেবে বলেছিল তা প্রায় শেষের দিকে। এবার টমাস কুক, স্টার্লিং প্রভৃতি গোষ্ঠী যা যা বানাতে চায়, বানিয়ে ফেলুক।

কিন্তু সরকার তার দায়িত্ব পালন করতেই পালিয়েছে পাখিদের একটা বড় অংশ। ‘হাব’-এর উত্তর প্রান্ত বরাবর তিস্তার জল ঢুকে পড়ার কারণে সৃষ্ট জলাশয়ে ঘুরে ঘুরে রকমারি পাখি দেখার জন্য এবং তাদের মেমারি কার্ডে ভরে ফেলার জন্য নৌকো ভাড়া পাওয়া যায়। দু’জনের বেশি নেবে না। ভাড়া পাঁচশো টাকা। যতক্ষণ খুশি ঘুরুন। দেখা গেল ডজন দেড়েক নৌকো ইতিউতি পাড়ে ভিড়িয়ে রাখা। ঘুরে বেড়ানোর লোক নেই। পক্ষীপ্রেমীরা যে দলে দলে আসতেন তা নয়, কিন্তু আসার একটা ধারাবাহিকতা ছিল। সে ধারাবাহিকতায় আঘাত পড়ে গেছে। নৌচালকরা অনেকদিন ধরে পাখি দেখানোর কাজে লেগে আছেন বলে সেখানে আসা পাখিদের জাতি-গোত্র, এমনকি বৈজ্ঞানিক নামও জেনে গেছেন। যখন জানলেন যে আমরা আসলে ‘লোকাল’, তখন নিশ্চিন্তে বিড়ি ধরিয়ে জানালেন, ‘নাই নাই। অনেক পাখিই নাই। কমে গ্যাসে। টুরিস্টদের কই না।’

‘হাব’ হবে কি না তা নিয়ে অবশ্য এলাকাবাসীর মতে প্রচুর দ্বিধা। এমনিতে গাজলডোবায় কেউ থাকতে আসেন না। শিলিগুড়ি থেকে পর্যটকের দল লাটাগুড়ির দিকে যাওয়া বা সেখান থেকে আসার সময় এখানে টহল মেরে যায়। বোদাগঞ্জের পর রাস্তা বেশ খানিকটা খারাপ থাকায় জলপাইগুড়ির দিকে থেকে পর্যটকরা একটু কম আসছেন। কিন্তু যাঁরাই আসুক, থাকেন না। অথচ এখানে থাকার ব্যবস্থা হলে লাটাগুড়ির বিকল্প হতে পারে অনায়াসেই। রিসর্টের বদলে থাকার ব্যাপারটা ‘হোমস্টে’ জাতীয় করার জন্য যুবকদের কেউ কেউ বেশ উৎসাহী। কিন্তু সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন না। গাজলডোবা ব্যারেজ সংলগ্ন এলাকা থেকে শিলিগুড়ি, লাটাগুড়ি, মালবাজার, চালসা— সব খুব জোর ঘণ্টাখানেকের রাস্তা। ঠিকমতো প্রচার আর আয়োজন করতে পারলে অবশ্যই ফল মিলবে। আর দু’দিন প্রকৃতির সঙ্গে কাটিয়ে আসতে চাইলে ব্যারেজের কাছাকাছি থাকাটা বেশ আনন্দের। সকালবেলায় তিস্তার তিন-চার ঘণ্টা আগে ধরা বোরলি পেয়ে যাবেন চমৎকার সাইজের। শ’পাঁচেক টাকা কেজি। বোরলির ঝোল-ভাত খেয়ে হোমস্টের যত্নে দুটো দিন শীতের রোদ্দুর মেখে চারপাশে ঘুরে বেড়ালেই প্রচুর অক্সিজেন! এর জন্য ‘হাব’ বানিয়ে জায়গাটার ‘ভাব’ বদলে দেওয়ার কোনও অর্থ নেই। ‘হাব’-এর অর্থ যে তার সীমানা ঘেঁষে থাকা অরণ্যানিসহ সমস্ত পরিবেশের ক্ষতি, সেটা কিন্তু এলাকার সবাই একবাক্যে স্বীকার করছেন।

তবে কি প্রজেক্ট গাজলডোবা বাস্তবে একটি দু’শো দশ একরের ফ্লপ শো হতে চলেছে? নাকি ভবিষ্যতে এটাই হয়ে উঠবে কোনও জাতীয় দলের ক্রিকেটার কিংবা বলিউডের স্টার নায়কের ছুটি কাটাবার অন্যতম স্বদেশি ‘ডেস্টিনেশন’?

আসুন, সবুর করি।

নিজস্ব প্রতিনিধি

গাজলডোবা টুরিজম হাব বাস্তুতন্ত্রে আঘাত করবে না

ডুয়ার্সের বৃহত্তম টুরিজম হাব কি সবুজকে কংক্রিটে মুড়ে ফেলবে না কি পর্যটনের সার্বিক উন্নয়ন ঘটাবে? পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দপ্তরের জয়েন্ট ডিরেক্টর সুনীল আগরওয়ালের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেছিলেন ‘এখন ডুয়ার্স’-এর প্রতিনিধি।

এখন ডুয়ার্স: গজলডোবায় কি সত্যিই হাব হচ্ছে?

সুনীল আগরওয়াল: অবশ্যই হচ্ছে। তিনটে পার্টির সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা হয়ে গিয়েছে, তাদের জমি আমরা বুঝিয়ে দিয়েছি। তার মধ্যে দুটো বাজেট ক্যাটাগরি ও একটি স্টার ক্যাটাগোরির ইকো-রিসর্ট।

এখন ডুয়ার্স: অনেক গাছ নাকি কাটা পড়েছে, পেছনেই তো বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্ট?

সুনীল আগরওয়াল: একটা গাছও কাটা পড়েনি। আমি আপনাকে হাবের আগের আর পরের ছবি দেখিয়ে দিতে পারি, তাহলে তো বুঝতে পারবেন। মিডিয়াতে এ কথা আগেও উঠেছে কিন্তু আমরা বারবার জানিয়েছি একটা গাছও কাটা পড়েনি।

এখন ডুয়ার্স: তাহলে বলছেন বাস্তুতন্ত্রের ওপর কোনও চাপ পড়ছে না?

সুনীল আগরওয়াল: শুনুন, ‘ওয়াটার বডি’র কোনও ক্ষতি তো আমরা করিনি উলটে নতুন ওয়াটার বডি তৈরি করেছি। হাবের পশ্চিমে তিস্তা নদী ও তার মূল ক্যানেলের মাঝে একটা সংযোগকারী ক্যানেল বানিয়েছি, যেটা হাব থেকে ফরেস্টকে বিচ্ছিন্ন রাখবে। পর্যটকরাও মূল অরণ্যে ঢুকতে পারবেন না। তাছাড়া লেক প্লাজায় যে লেকটা আছে ওটা ছিলই, আমরা আরও জলের ব্যবস্থা করে তার আয়তন বাড়িয়ে দিয়েছি।

এখন ডুয়ার্স: এতেই বাস্তুতন্ত্র পুরোপুরি রক্ষা পাবে?

সুনীল আগরওয়াল: আরও আছে। হাবের উত্তরসীমা বরাবর রাস্তার পাশে টানা ফেন্সিং দেওয়া হয়েছে যাতে কেউ নদীতে নেমে নৌকো চালাতে না পারে। ওটা বার্ডওয়াচিং এরিয়া।

এখন ডুয়ার্স: কিন্তু স্থানীয় লোকেরা যে বলছে পাখিদের আসা আগের থেকে অনেক কমে গিয়েছে?

সুনীল আগরওয়াল: কোথায়? আমার কাছে হিসেব আছে এবারেও ১২০০ পাখি এসেছে। পাখি কমবে কেন? আমরা ওয়াটার বডির পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়ায় বরং ওদের সুবিধেই হচ্ছে। আরে, ফরেস্টের কোনও ক্ষতি হলে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট কি আমাদের ছেড়ে দিত?

এখন ডুয়ার্স: পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত যে মামলা করলেন, তিনি তো যথেষ্ট তথ্য আদালতের কাছে পেশ করেছেন। তাতে কি হাবের কাজ থমকে গিয়েছে?

সুনীল আগরওয়াল: না, একেবারেই না। আদালতে মামলার কথা জানি। কিন্তু আমাদের কাছে কাজ বন্ধ রাখার কোনও নির্দেশ আদালত দেয়নি। সুতরাং কাজ চলছে। বিদ্যুতের জন্য সাবস্টেশন, পানীয় জল, বিদ্যুতের লাইন, রাস্তা— সবই প্রায় শেষের দিকে। আর কিছুদিনের মধ্যেই সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে।

এখন ডুয়ার্স: শুনছি, হাব সংলগ্ন জমির দাম খুব বেড়ে যাচ্ছে?

সুনীল আগরওয়াল: না, আমার কাছে তো সেরকম কোনও খবর নেই। বোদাগঞ্জের ওদিকটায় হয়ে থাকতে পারে, সেটা আমার জানা নেই।

এখন ডুয়ার্স: তাহলে বলছেন গজলডোবায় টুরিজম হাব হচ্ছেই?

সুনীল আগরওয়াল: সেন্ট পার্সেন্ট।

পরিবেশ বিপন্ন করেই কি হবে ডুয়ার্স উন্নয়ন ?

বিপন্ন ডুয়ার্সের প্রকৃতি-পরিবেশ— এ কথা আজ আর নতুন নয়। তরাই-ডুয়ার্সের যেসব নদী দূষণে আক্রান্ত, সেগুলির মধ্যে শোচনীয় পরিস্থিতিতে রয়েছে মহানন্দা-তিস্তা-বালাসন-মাল-নেওড়া- লইটি-গুলমাই-ডিমডিমা-ঘিস-করল।

কী ধরনের দূষণ ঘটছে নদীগুলিতে— নদীগুলি থেকে যথেচ্ছভাবে বালি ও পাথর তোলা হয়েছে বছরের পর বছর। জেনে-বুঝে স্থানীয় কিংবা জেলা প্রশাসন চোখ বন্ধ করে আছেন। বেআইনি ওই কাজে বাধা দেওয়া হয়নি কখনওই।

কী ঘটছে এর ফলে— নদীগুলির ভূপ্রাকৃতিক গঠন নষ্ট হয়েছে কমবেশি। যে নদীগুলির উপর সেতু আছে, সেগুলি হয়ে গিয়েছে নড়বড়ে। অনেক জায়গায় বিপদসীমাও ছুঁয়েছে। অথচ নির্দেশ দেওয়া আছে যে, সেতু থেকে ৩০০ মিটার পর্যন্ত যে কোনও ধরনের নির্মাণই অবৈধ। কারণ, তা সেতুর পক্ষে বিপজ্জনক। অন্য দিকে, পাহাড়ি নদীগুলির গভীরতা কমছে পর্যায়ক্রমে, এর ফলে খরস্রোতা নদীগুলির গতিও বাড়ছে।

স্থায়ীভাবে জনবসতি তো রয়েইছে, সেই সঙ্গে রিসর্ট, খামার, খাটাল ইত্যাদির সংখ্যা নদীগুলির দুই ধারে যেমন বেড়েছে, তেমনই তাদের আবর্জনা বা বর্জ্যগুলি ফেলা হচ্ছে নদীতে। এর মধ্যে রয়েছে প্লাস্টিক, থার্মোকল ইত্যাদি। জলে যাদের পচন ধরে না। কিন্তু তার থেকে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় জলজ প্রাণীকুল।

মানুষ থেকে শুরু করে পশুর মল জলে মিশছে প্রতিনিয়ত। আর তার থেকে বেড়ে চলেছে ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়ার মাত্রা। চা-বাগানগুলিতে ব্যবহৃত কীটনাশক জলে ধুয়ে এসে মিশছে নদীতে। এর ফলে মারা পড়ছে মাছ। তিস্তা-করলা ইত্যাদি নদীতে প্রায়শই ভেসে উঠছে অগুনতি মাছ।

কোথাও কোথাও নদী সংলগ্ন জমির উপর অবৈধ নির্মাণ বাধা হয়ে উঠেছে নদীর স্বাভাবিক গতিপথের। বিভিন্ন সময়ে পরিবেশবিদরা নির্দিষ্ট নদী ও তার পাড়ের দূষণ নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখ করা যায়—

ক) মহানন্দা নদী থেকে বহুকাল ধরেই অবাধে তোলা হচ্ছে বালি ও পাথর। বহু জায়গায় ওই নদীর পাড়েই গজিয়ে ওঠা বস্তি, খাটাল ও শুয়োরের খামার স্থায়ী রূপ নিয়েছে।

খ) মাল নদীতে ট্রেকার বোঝাই প্লাস্টিক ও ওই জাতীয় বর্জ্য ফেলা হচ্ছে। কখনও কখনও ওই নদীর চরেই আবার সেই বর্জ্য আগুন লাগিয়ে পোড়ানো হয়।

গ) সাম্প্রতিককালে জেসিবি মেশিন নেওড়া নদীতে বসিয়ে বালি কেটে তোলা চলছে। নদীর চরে কংক্রিটের স্তম্ভ বসানোরও কাজ চলছে নির্মাণের জন্য।

ঘ) শীতকালে তিস্তার খাত শুকিয়ে গেলে বালি তোলা হয় বহুকাল ধরেই। নদীখাত কেটে বালি তোলা হলে নদীর গভীরতা বৃদ্ধির পক্ষে ভাল, তবে তা অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে করতে হয় নদীর জায়গা বুঝে। কিন্তু অবৈধ বালি উত্তোলনে সেসব কি মানা হয়?

কাদের মদতে এ ধরনের সম্পূর্ণ বেআইনি কার্যকলাপ চলে অবাধে?

নদীর পাশাপাশি ডুয়ার্সের জঙ্গল পরিস্থিতিও ভয়ানক বিপর্যস্ত। ক্রমশ বদলে যাচ্ছে জয়ন্তি, বক্সাসহ ডুয়ার্সের আরও বহু বনাঞ্চল। জঙ্গলে শান্তিতে নেই বন্য প্রাণীরা। পাখিদের অবস্থাও প্রাণান্তকর। যেসব অঞ্চল ছিল মনোরম-শান্ত-স্নিগ্ধ, সেখানে এখন হট্টগোলের শেষ নেই। কাকভোর থেকেই সাফারি, বিভিন্ন প্রমোদভ্রমণের সারি সারি গাড়ি ছুটে চলেছে জঙ্গলের গভীরে। শুধু যে গাড়ির সারি তা তো নয়, তাদের শব্দ এতটাই বিকট যে চমকে উঠতে হয়। গভীর নির্জন জঙ্গলে হর্ন তো দূরের কথা, বিকট কোনও শব্দও তো আইনত নিষিদ্ধ। তাহলে চমকে ওঠা শব্দ, যা নিস্তব্ধতা ভাঙে, চমকে দেয়, তা বেজে ওঠে কীভাবে? তাহলে গাড়ির মালিক কিংবা পর্যটকদের জন্য ওই নিষেধ কি মুকুব হয়ে গিয়েছে? হর্নের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই বাড়ছে লজ। দশ বছর আগেও যেসব জঙ্গলের আশপাশে একটিও বেসরকারি হোটেলের দেখা মিলত না, আজ সেখানে একাধিক লজ মাথা তুলেছে।

জলদাপাড়া এলাকায় গজিয়ে উঠেছে একাধিক কংক্রিট নির্মাণ। প্রতিদিন মানুষের যাতায়াত বাড়ছে। দূষিত হচ্ছে নদী-ঝোরা। এর কুপ্রভাব পড়ছে বন্য জীবনে। প্রশ্ন, কেন বিস্তীর্ণ এলাকার জঙ্গলে ভোর থেকে সন্ধে পর্যন্ত ডজন ডজন গাড়ি হর্ন বাজিয়ে হুসহাস করে ছুটে বেড়াবে? কেন কংক্রিটের নির্মাণ হবে বনের পরিবেশে?

আগে যেসব নদী-ঝোরার ধারে জন্তুজানোয়াররা তৃষ্ণানিবারণের জন্য আসত, তাদের আর দেখা মেলে না। তারা ক্রমশই আরও গভীরে ঢুকে গিয়েছে। কিন্তু তাতেও কি রেহাই মেলে? সাফারির দল সেই গভীর পর্যন্ত ধাওয়া করছে। আর কত পিছু হটবে তারা? এভাবে যে শুধু ডুয়ার্স জঙ্গলের নির্জনতা কিংবা শান্তি ভগ্ন ঘটছে তা নয়, ক্রমশ আয়তনও সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে।

গত শতাব্দীর ছয়ের দশকে, এমনকি সাতের দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্তও বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প জঙ্গলের যা পরিধি ছিল তা প্রায়

প্রকাশিত চিঠি পাঠকের নিজস্ব অভিমত। তার জন্য 'এখন ডুয়ার্স' সম্পাদকমণ্ডলী দায়ী নয়।

অর্ধেক হয়ে গিয়েছে এই সময়। প্রায় প্রতিদিনই রেলে কাটা পড়ে অথবা ধাক্কা খেয়ে মৃত্যু ঘটছে হাতি, বাইসনের। কিন্তু কার তাতে কী? নিয়মের তোয়াক্কা না করে ডুয়ার্সের জয়ন্তিসহ প্রায় সব বনবস্তিতেই মাথা তুলেছে বিভিন্ন নির্মাণ। জঙ্গলের লজগুলিতে ক্যাম্প ফায়ার নামক এক বিশৃঙ্খলতা তৈরি করছে। যত্রতত্র মদের বোতল, প্লাস্টিকসহ আবর্জনা দিয়ে ভরিয়ে দিচ্ছে জঙ্গল এলাকা। আর সেইসব আবর্জনার শেষ পর্যন্ত ঠাঁই হচ্ছে নদীতে। এত কিছুর পরও কারও কোনও হেলদোল নেই। কোনও নজরদারি নেই। আছে শুধু মিথ্যে আশ্বাস। বিপন্ন নদীর পাশাপাশি অরণ্যের উপরও পড়েছে মানুষের কোপ। ওই কুঠারের কোপে পরিবেশের ভারসাম্য যেমন বিঘ্নিত, একইভাবে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে বন্য প্রাণীদের জীবনযাপন।

ডুয়ার্সের বক্সার ভিতরে জয়ন্তি নদীর ধার ঘেঁষে রয়েছে একাধিক রিসর্ট এবং লজ। সেগুলি বেশ কয়েক বছর যাবৎ পিক সিজনে রমরমিয়ে ব্যবসা করছে। কিন্তু একটিরও নেই কোনও ধরনের অনুমোদন। প্রশাসনের উপর থেকে নীচ সব মহলেরই জানা আছে তা। বন দপ্তরের চোখের সামনেই সেখানে চলে আমোদপ্রমোদ, কিন্তু সবাই দৃষ্টি সরিয়ে রেখেছেন অন্যত্র। কিন্তু অবস্থা শোচনীয় বনের জন্তুজানোয়ারদের। জয়ন্তি নদীতে যেসব জন্তুজানোয়ার জল খেতে আসে, তারা আসবে কীভাবে? রিসর্ট-লজ-মানুষজন-আমোদপ্রমোদকে স্বভাবতই ভয় পায় তারা। ফলে এখানে জল না পেয়ে তাদের অন্যত্র চলে যেতে হয়।

তরাই-ডুয়ার্সের নদীগুলি থেকে যেমন যথেচ্ছ বালি-পাথর উত্তোলন চলছে, তেমনই বক্সার ভিতরেও নদী থেকে লরি বোঝাই হচ্ছে এবং অন্যত্র পাচার হচ্ছে অবৈধভাবে। আর ওইসব লরি জঙ্গলের ভিতর দিয়েই আসে এবং বালি-পাথর বোঝাই করে চলে যায়। প্রশাসন-বন দপ্তরের কর্তা-কর্মী এ ব্যাপারেও নিজেদের চোখ ঢাকা দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু জঙ্গলের ভিতরকার নদীতে বালি তোলা, পাথরভাঙা ইত্যাদি কাজে যেমন শব্দ দূষণ চলছে, তেমনভাবেই বাড়ছে বায়ু দূষণ। পাশাপাশি লরি-ট্রাকের ধোঁয়া থেকেও বিষাক্ত হচ্ছে বনের পরিবেশ। কাদের প্ররোচনায় বছরের পর বছর এমনটা নিয়মে পরিণত হল?

জঙ্গলের ভিতর বা গা ঘেঁষে রিসর্ট-লজ থাকলে সেখানে পর্যটকদের ভিড় হওয়াই স্বাভাবিক। সরকারও তো আন্তরিকভাবেই চায় ডুয়ার্সের পর্যটন উন্নয়নে বন্যা আসুক। আর রিসর্ট বা লজ ব্যবসায়ীরা পর্যটকদের ভিড় বাড়াতে তাঁদের আতিথেয়তায় যাতে কোনও ত্রুটি না ঘটে, সে জন্য তৎপর হবেন। কিন্তু রিসর্ট বা লজের বর্জ্য পদার্থ যেমন জঙ্গলে ছড়াচ্ছে, তেমনভাবেই গিয়ে পড়ছে নদীতে। নদী দূষিত হচ্ছে। সেই জল খেয়ে জন্তুজানোয়াররা রোগাক্রান্ত হচ্ছে। প্রশ্ন হল, পরিবেশগত ছাড়পত্র না পেয়েই কি এইসব রিসর্ট-লজ গজিয়ে গেল? আর তা যদি না-ই হয়ে থাকে, তবে তার ছাড়পত্র দিল কারা? পর্যটনের উন্নয়ন ঘটাতে গিয়ে ৭৫০ কিমির থেকেও বেশি এলাকা, যাকে এলাকাকে ১৯৮৩ সালে ব্যাঘ্র প্রকল্পের মুকুট পরানো হল, তাকে ধ্বংস করাই কি এখন অন্যতম লক্ষ্য?

দেবশ্রী বসু, আলিপুরদুয়ার

বক্সা পাহাড় ভুল তথ্য

গত ১ জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যটনের ডুয়ার্স কলমে 'খোঁড়া পায়ে বক্সা পাহাড়' শীর্ষক প্রতিবেদনে কয়েকটি ঐতিহাসিক তথ্যের ত্রুটি রয়েছে। ১) সিংচুলা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ১৮৬৫ সালের ১১ নভেম্বর। ১৮৬৪-র ৭ ডিসেম্বর তারিখটি ভুল। ২) সেই চুক্তি মোতাবেক ১০ হাজার টাকা নয়, ৫০ হাজার টাকার বিনিময়ে, আর বক্সাগিরি তথা দুর্গের দখল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নয়, ব্রিটিশ সরকার নেয়। কারণ সিংচুলা চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার আগেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে এবং ১৮৫৮ সালে প্রথম ভাইসরয় অভিষিক্ত হন লর্ড ক্যানিং।

তথাগত দাশগুপ্ত, আলিপুরদুয়ার

'এখন ডুয়ার্স'-এর বিনম্র শ্রদ্ধা

চোমং লামা

নব্বই অতিক্রান্ত উত্তরবঙ্গের বর্ষীয়ান সাহিত্যস্রষ্টা চোমং লামা চলে গেলেন গত ২৪ জানুয়ারি ২০১৬। চা- বাগানের শ্রমিক ও মানুষ নিয়ে তাঁর দীর্ঘ উপন্যাস 'পাতার নাম জনম' দারুণ সাড়া জাগায়। তাঁর আরও কিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ— নকশালবাড়ি আন্দোলন নিয়ে 'নকশালবাড়ি', গৌড়ের ইতিহাস নিয়ে 'গৌড়জনকথা'। লিখেছিলেন আত্মজীবনী 'এই জীবনের বৃত্তান্ত', এছাড়াও 'একদিন কোথায় ছিলেন', 'পারাপারের বৃত্তান্ত', 'এ আলোতে এ আঁধারে' চোমং লামার ছোটগল্প ইত্যাদি। নাগাল্যান্ড ঘুরে এসে সেখানকার আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে লেখা 'নগশীর্ষ নাগাভূমি' তাঁর সংবাদধর্মী গ্রন্থ। দুই শতাধিক গল্প প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। ১৩৩২-এর ২৫শে বৈশাখ যশোর জেলার নড়াইল মহকুমার গোবরা-বাহির গ্রামে তাঁর জন্ম। প্রায় ষাট বছর কাটিয়েছেন উত্তরবাংলায়। চা-বাগানে কাজ করতেন। জীবনের অভিজ্ঞতাই তাঁর গল্প উপন্যাসকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। এক সময় দৈনিক বসুমতী পত্রিকায় নিয়মিত কলাম লিখতে গিয়ে তিনি ছদ্মনাম নেন চোমং লামা। আসল নাম বিমল ঘোষ চাপা পড়ে যায় এই নামের খ্যাতিতে। যুগান্তর পত্রিকাতেও লিখতেন পোস্ট এডিটোরিয়াল। পরবর্তীতে পুরোপুরি চলে আসেন কথাসাহিত্যের বিশ্বে।

জীবন সরকার

'এখন ডুয়ার্স'-জানুয়ারি ২০১৫ থেকে অগাস্ট ২০১৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর ধারাবাহিক উপন্যাস 'তিস্তা'। কলকাতায় থাকলেও তাঁর মন পড়ে থাকত ডুয়ার্সেই। ডুয়ার্স তথা উত্তরের লেখক-কবিদের সঙ্গে ছিল অন্তরের টান। বছরে একবার দু'বার ধূপগুড়িতে আসতেন। সহজ-সরল মানুষটির গদ্যও ছিল সরল, আন্তরিকভাবে জীবনের ছবি আঁকতেন জীবন সরকার। প্রায় ছয় দশক আগে লেখা গল্প 'কাছিম' তাঁকে গল্পকার হিসেবে বাংলা সাহিত্যে জায়গা করে দেয়। 'চালি', 'সেজানের দিনরাত্রি', 'কাঁটাতার', 'পানি আহিছে' ইত্যাদি গল্পও সাড়া জাগায়। লিখেছেন উপন্যাসও— নদীর নামে নাম, বামনহাটি প্যাসেঞ্জার, রাস্তায় রক্তের দাগ, ওরা চারজন, বড়মা বৃত্তান্ত, প্রত্যাখ্যান ইত্যাদি। তিনি লিখেছেন— 'বাংলাদেশ ও উত্তরবাংলার মানুষ, নদনদী, নিসর্গই আমাকে গল্পকার করেছে। আমার গল্পে ভাষা জোগান দিয়েছে।' গত ১৯ জানুয়ারি ২০১৬ রাতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জন্ম ১৯৪১-এর ৫ নভেম্বর, ঢাকার বিক্রমপুরের বালিয়াকান্দা গ্রামে। ১৯৫১-তে বড়দা-বড়বৌদির সঙ্গে ছিন্নমূল হয়ে এই বঙ্গে আসা।

অকৃতদার জীবনবাবু মৌলালির কাছে অনরেট ফার্স্ট লেনে থাকতেন। ছোট্ট ঘরটি ভরতি বইপত্রে আর লিটল্ ম্যাগাজিনে। একসময় টাকশালে কাজ করতেন, লেখার নেশায় চাকরির গতানুগতিক জীবন থেকে বেরিয়ে আসেন। তারপর লেখাতেই বাঁচা। থেকে গেল নিরহংকারী জীবনশিল্পীর অনেক নির্মাণ। তিনি বেঁচে থাকবেন তাঁর মৃত্তিকাগন্ধী লেখায়।

চিন-ভারত যুদ্ধ শুরু হলে প্রতিরক্ষা তহবিলের জন্য চাঁদা তোলা শুরু হয়। মানুষ যাতে সেই তহবিলে দান করেন তার জন্য বিখ্যাত মানুষরা ঘুরে ঘুরে সভা করতেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার তহবিলের অধিকাংশ টাকা উঠল খালাসি পট্টি থেকে। আর এর পিছনে যার অবদান ছিল বেশি সে ওই সময়ে কোচবিহার শহরের একজন কুখ্যাত ব্যক্তি। একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জীবন ধারাভাষ্যে সমাজ রাজনীতি ছাড়াও উঠে আসে এমন সব আশ্চর্য মানুষ ও ঘটনা।

দেবপ্রসাদ রায়

৩

দ্বিতীয় দফায় আলিপুর জংশনে বাবার বদলির কারণে আসার পর আমরা চেচাখাতায় বাড়িভাড়া নিয়েছিলাম, তা আগেই বলেছি। সেকালে চেচাখাতা ছিল ছোট ছোট বাড়ি আর নানারকম গাছপালায় ঘেরা একটা জনপদ। ফাঁকে ফাঁকে মাঠ। প্রকৃতি পুরোমাত্রায় উপস্থিত সেখানে তখন। এখন অবশ্য বহু বাড়িঘর হয়েছে চেচাখাতায়। জনসংখ্যা বেড়েছে অনেক। তাই বাল্যের চেচাখাতার সেই শান্ত, স্নিগ্ধ, গ্রামীণ পরিবেশটা আর নেই। মফস্‌সলের আর পাঁচটা শহরের মতো চেচাখাতাও একটা শহর। এর ফলে চেচাখাতা যে তার আকর্ষণ খানিকটা হারিয়েছে, সেটা স্বীকার করতে হবে।

কোচবিহার শহর অবশ্য তখন বেশ সাজানো-গোছানো। রাজ আমলের পারিপাট্য তখনও বজায় ছিল বলে মনে পড়ে। আলিপুরদুয়ার যেমন ছিল গাছপালায় ভরা, তেমন কোচবিহার ছিল দিঘিতে। প্রতি পাড়াতেই এক বা একাধিক দিঘি। কিন্তু সেই দিঘিময় কোচবিহারও হারিয়ে গিয়েছে। প্রোমোটিং-এর কারণে অনেক দিঘি বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে শুনেছি। সবগুলো এখনও দেখা হয়নি। আমরা যে দিঘির কাছে থাকতাম, সেই মড়াপোড়া দিঘিও বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে দেখেছি। কোচবিহারের দিনগুলির প্রসঙ্গে সবচাইতে আপশোসের কথাটা এবার বলি। সেখানকার রাসমেলা কেমন বিখ্যাত তা আর বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। স্কুলজীবনে সেই মেলা দেখার মজা কতটা হতে পারে তা যে কেউ অনুমান করতে পারবেন। কিন্তু কোচবিহারে থাকাকালীন প্রতিবার রাসমেলা আর আমার স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার দিনগুলি পড়ত প্রায় একই সময়ে। ফলে পরীক্ষা শেষে আমার কপালে জুটত মেলার লেজটা। তাই প্রতিবারই ভাঙা মেলায় ঘুরে ঘুরে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতাম আমি। দাদাদের পরীক্ষা অবশ্য মেলার আগেই শেষ হয়ে যেত। তারা মেলা দেখত জমিয়ে আর আমি অপেক্ষা করতাম কবে মেলার লেজটুকু ধরতে পারব।

এই আপশোস আমার এখনও গেল না।

তবে যাত্রা দেখেছি প্রাণভরে। 'সোনাই দিঘি', 'সতীর ঘাট', 'বাঙালি', 'বিদ্রোহী সন্তান'— এমন কত যে পালা! সব আর মনে নেই এখন। রাসমেলার মাঠে শীতকালে যাত্রা হত। সে যাত্রা তো দেখতেই হবে— কিন্তু পয়সা কোথায়? ছোট ভাই পিন্টু বলত, 'দেখাবার দায়িত্ব আমার। তুই শুধু মায়ের কাছ থেকে অনুমতি জোগাড় কর।' অতঃপর মায়ের কাছে কেবলই বলতাম, 'মা! যাত্রায় যাব! যাত্রায় যাব!' বারবার বলতে শুনে মা একবার হয়ত বলে ফেলতেন, 'যেখানে খুশি যা!' ব্যস, ওটাই পারমিশন। আমি চাদর কাঁধে ফেলে মাঠ দিয়ে দে দৌড়!

যাত্রা কিন্তু পিন্টুই দেখাত। কেবল পদ্ধতিটা 'বিশেষ'। সে রোজ অস্থায়ী শৌচাগারের বেড়া ফাঁক করে ভেতরে ঢুকে 'গেট পাস' নিয়ে আসত। সেটা আমাকে দিয়ে বলত, 'তুই ঢোক। আমি পরে আসছি।' একটু পরে সে ওই পথেই এসে বসে পড়ত। তবে যাত্রা শেষ হওয়ার একটু আগে বেরিয়ে এসে দৌড়ে বাড়ি ফিরতাম। কারণ, বাবা ফেরার আগে ফিরতে হবে। বাবা রোজই যাত্রা দেখতেন এবং একজন শৌখিন অভিনেতাও ছিলেন।

একদিন পিন্টু যতবারই অস্থায়ী শৌচালয় ঢোকার চেষ্টা করছে, ততবারই কেউ না কেউ শৌচালয় থাকায় ব্যর্থ হচ্ছে। সে দিন আর ঢুকতেই পারলাম না। ফলে করুণ মুখে বাইরে ঘুরছি। সঙ্গে দু'-একজন বন্ধুও ছিল। যাত্রার কর্মকর্তাদের একজন ছিলেন দনুদা। এক বন্ধু ওঁকে বলল, 'দনুদা! যাত্রা দেখাবেন?'

'আমার কি বাবার যাত্রা, যে দেখাব?' উনি জবাব দিলেন। তারপর ফিরে এসে বললেন, 'কাল আসিস। কাল দেখাব।'

আমি নিরীহ মুখে জিজ্ঞেস করলাম, 'কাল কি আপনার বাবার যাত্রা?'

দনুদা প্রতিক্রিয়ায় 'তবে রে!' হুংকার দিয়ে তেড়ে এসেছিলেন। কিন্তু ততক্ষণে আমি মাঠ টপকে পগারপার।

ছাত্রজীবনে লেখাপড়া, খেলাধুলার বাইরে আমার সময় কাটত ছবি এঁকে আর এমব্রয়ডারি করে। এই দুটো ছিল আমার শখ। ছবি আঁকা শিখিনি। আর এমব্রয়ডারি ব্যাপারটা সেকালে বেশ জনপ্রিয় ছিল। বিশেষ করে পিক্টোগ্রাফি, মানে ভেলভেটের উপর রঙিন সুতো দিয়ে নকশা তোলার ব্যাপার। আমি এটা বেশ ভালই পারতাম।

আমাদের নিজেদের বাড়ি ছিল না। বাবা আমৃত্যু ভাড়াবাড়িতে থেকেছেন। ভাড়াটে হওয়ার কারণে অবশ্য একই শহরের বিভিন্ন পাড়ায় থাকার সুযোগ হত আমার। কোচবিহারে প্রথমে ছিলাম জে এন

হাসপাতালের কাছে, তারপর নতুনবাজারে এবং শেষে ব্যাংচাতরা রোডে। শেষ পাড়াতেই কোচবিহার জীবনের সিংহভাগটা কেটেছিল। যেহেতু ছবি আঁকতাম আর গল্পের বই পড়াতেও খুব আগ্রহ ছিল, তাই নিউ সিনেমার উলটো দিকে একটা বইয়ের দোকানে যাতায়াত ছিল নিয়মিত। সেই দোকানটার নাম সম্ভবত গ্রন্থভারতী অথবা গ্রন্থনীড়। দোকানটা চালাতেন দুলালদা বলে একজন। তিনি দোকানে বসেই চমৎকার সব ছবি আঁকতেন। সংগত কারণেই আমি দোকানে গিয়ে তাঁর ছবি-আঁকা দেখতাম। তিনি আমাকে জলরঙের ব্যবহার শিখিয়েছিলেন বলে মনে আছে।

দুলালদা ছবি আঁকায় আমাকে খুব উৎসাহ দিতেন। আমিও তাঁর বেশ ভক্ত ছিলাম। একদিন তিনি বললেন, 'চলো মিঠু! তোমাকে একটা খেলার জায়গায় নিয়ে যাব।' আমি তাঁর সঙ্গে গেলাম। একটা জায়গায় গিয়ে দেখি সেখানে রকমারি খেলার আয়োজন। হাডুডু, যোগব্যায়াম প্রভৃতি। সেখানে একটা গেরুয়া পতাকাও তোলা হয়েছিল এবং তার সামনে প্রার্থনাও চলছিল। আপাতদৃষ্টিতে জায়গাটা আমার খারাপ লাগেনি। খেলাধুলার পাশাপাশি শরীর মজবুত রাখার কলাকৌশল, কিছু সুশিক্ষা প্রদান— যেমন কুকথা না বলা, বড়দের সম্মান করা— এসব বেশ যত্ন নিয়ে বড়রা শেখাতেন বলে আমার ভালই লাগত সেখানে যেতে। আমি একটু নরম স্বভাবের হওয়ায় সেসব পছন্দ করতাম।

সেটা ছিল রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘর একটি শাখা। কিন্তু এর তাৎপর্য তখন বুঝিনি। ১৯৬৪ সালে জলপাইগুড়ি চলে যাওয়ার পর অনিয়মিত হলেও যোগাযোগ ছিল শাখার সঙ্গে। শাখার লোকজনও আমার খোঁজ রাখতেন। কিন্তু কোনও একটি নির্বাচনের প্রাক্কালে, আমি তখন হায়ার সেকেন্ডারি দিয়ে রেজাল্টের অপেক্ষায় আছি, তখন প্রদীপদা বলে একজন শাখার পক্ষ থেকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে জানালেন যে, নির্বাচনে জনসংঘর হয়ে আমাকে মালদায় প্রচারে যেতে হবে। শাখার সঙ্গে জনসংঘর সম্পর্ক আমার অজানা ছিল। তাই বিস্মিত হয়ে বললাম, 'আমাকে তো কখনও জানাননি যে আমাদের জনসংঘ করতে হবে? আমাদের পরিবার কংগ্রেসি পরিবার। মা-বাবা-দাদা সকলেই কংগ্রেসি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। ক'দিন আগেই জলপাইগুড়ি পুরসভার নির্বাচনে বাবা মোহিত সান্যালের হয়ে চুটিয়ে প্রচার করেছেন।'

প্রদীপদা বললেন, 'তা জানাইনি। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে আমরা জনসংঘর সঙ্গে জড়িত।'

ফলে সে দিনই রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘর সঙ্গে আমার সম্পর্কের ইতি ঘটল।

সোনাউল্লা স্কুলের তিন বছরের ভূগোল এক বছরে পড়ার শর্তে সংস্কৃতর হাত থেকে নিস্তার পেয়ে আমি ভরতি হয়েছি এবং শিক্ষকরা আমার প্রতি বেশ মনোযোগী। দীপেন স্যারের অনুপ্রেরণার জন্যই হোক বা নলিনী স্যারের বিদ্রুপকে মিথ্যে প্রমাণের জন্যই হোক— আমি ভেতর থেকে তখন একটা তাগিদ অনুভব করছিলাম। মনে হচ্ছিল হায়ার সেকেন্ডারিতে আমি মোটামুটি ভাল একটা কিছু করতে পারাব। পারলামও। এখন অবশ্য স্টার আর ফার্স্ট ডিভিশনের এত ছড়াছড়ি যে সেকেন্ড ডিভিশনের কথা কেউ মনেই রাখে না। কিন্তু আমাদের সময় সেকেন্ড ডিভিশনের দাম ছিল। ফার্স্ট ডিভিশনের কাছাকাছি নম্বর পাওয়া হাই সেকেন্ড ডিভিশনকে বেশ ভাল ছাত্র বলেই মানা হত। আমি পাশ করলাম ৫৫৭ পেয়ে। তিন বছরের ভূগোল এক বছর পড়ে পেলাম দু'শোর মধ্যে একশো সাতাশ।

নলিনী স্যার চুড়ি পরেননি, কিন্তু আমি তাঁকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে জলপাইগুড়ি এসি কলেজে ভরতি হওয়ার জন্য পা বাড়ালাম। সেখানে নানা ছাত্র সংগঠনের হাতছানি। বামপন্থী বিপিএসএফ (তখনও 'আই' বসেনি) সংগঠন যে করব না, তা সেই ১৯৬২ সালেই ভেবে রেখেছি। বাড়িতে ছাত্র রাজনীতির চর্চা ছিল ভিক্টোরিয়া কলেজে পড়া আমার এক দাদার সৌজন্যে। তখন সেই কলেজে 'এনটিএসএফ' নামক একটি ছাত্র সংগঠন খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। দাদা ছিল তার সদস্য। পরে ভিক্টোরিয়া কলেজে এনটিএসএফ করা গুরুপদ দে কোচবিহারে কংগ্রেসের নেতৃত্বে এসেছিলেন। আরেকজনের নাম মনে আছে— সাধন সেনশর্মা। এইসব কারণে আমি ভেবেছিলাম যে কলেজে এনটিএসএফ করব।

কিন্তু জলপাইগুড়িতে এনটিএসএফ-এর কোনও সংগঠন ছিল না। ছিল ছাত্র পরিষদ আর বিপিএসএফ। মনে হয় তখনও এসএফ নামটি চালু হয়নি।

জলপাইগুড়িতে বাবা বাড়ি ভাড়া করে উঠেছিলেন কামারপাড়ায়, গোরা নন্দীর বাড়িতে। চোখের সামনে প্রতিবেশী বলতে তখন প্রশান্ত চৌধুরী, মুকুল ভৌমিকরা। মুকুল ভৌমিকের বাবা বরেন ভৌমিক তখন মালবাজারের বিধায়ক। তাঁর চেহারাও বেশ রাশভারী। এই অবস্থায় মুকুল ভৌমিকের হাত ধরে আমি প্রবেশ করলাম ছাত্র পরিষদে। তিন নম্বর ঘুমটির কাছে, কল্লোল বসুর বাড়ির উলটো দিকে একটা ছাপড়া ঘরে ছিল অফিস। আনন্দপাড়া থেকে গোবিন্দ গাঙ্গুলি এসে রোজ সন্ধ্যায় অফিস খুলে বসতেন। আর আমাদের ফ্রেন্ড-ফিলসফার-গাইড ছিলেন অস্তিদা। অস্তি বিশ্বাস। যদিও তিনি তখন প্রাক্তন ছাত্র নেতা, কিন্তু তখনও ছাত্র পরিষদকে তিনিই দেখতেন।

কলেজে প্রথম বছরেই আমি সিআর হিসেবে দাঁড়ালাম এবং জিতলাম। কিন্তু ফল

কোচবিহার রাজবাড়ি

হল ছাত্র পরিষদের বিপক্ষে ১৭-১৬। একটা আসন কম পাওয়ায় সংসদ গঠন করতে পারলাম না। ভাবা হয়েছিল যে আনন্দপাড়ায় বাবলু বসু যদি জিএস হয়, তবে আমি এজিএস হব। বাবলু বসু এসও করতেন। কিন্তু তিনি জিএস হতে রাজি না হওয়ায় আমাদের আর সংসদে যাওয়া হয়নি।

এসি কলেজের তখনকার সংবিধান অনুযায়ী 'প্রোভাইস' বলে একটা পদে সরাসরি নির্বাচন হত। সব ক্লাসের ছাত্রছাত্রী প্রোভাইস পদপ্রার্থীকে সরাসরি ভোট দিয়ে নির্বাচন করত। অনেকটা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মতো।

তখন সময়টা ১৯৬৫। কংগ্রেসের পক্ষে বেশ খারাপ সময় আসার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল তখন। কংগ্রেস বিরোধী আলাপ-আলোচনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। বুঝতে পারছিলাম যে সামনে কঠিন সময়।

(ক্রমশ)

ভারতীয় ছিটবাসীদের জীবনে অন্ধকার নামে বাংলাদেশ সরকারের উপর অগাধ নির্ভরতায়

বাংলাদেশে ভারতীয় ছিটমহলগুলিতে ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় কমিটির দাদাগিরি চলে বাংলাদেশ প্রশাসনের অনুপস্থিতিতে এবং প্রত্যক্ষ মদতে। তারা জনগণনা থেকেও বাদ দেয় প্রকৃত ছিটবাসীদের নাম। খুন-সন্ত্রাস ছাড়াও ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় কমিটির আড়ালে ভূমিদস্যুদের মূল কাজের মধ্যে এটি ছিল অন্যতম। ছিট জনগণনার ত্রুটি নিয়ে **নবম পর্ব**

ছিটমহলে জনগণনা শেষ কবে হয়েছিল? এ প্রশ্ন অনেকের কাছে বিস্ময় কিংবা অজানা। তবে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, ১৯৭৪ সালে ইন্দিরা-মুজিব চুক্তির পর ১৯৮১, ১৯৯১ ও ২০০১ সালে দেশের সর্বত্র গণনা হলেও ছিটমহলগুলিতে হয়নি। ফলে সেখানকার কোনও পরিসংখ্যান সংশ্লিষ্ট সকলের কাছেই অধরা। ২০১১ সালে জনগণনার উদ্যোগ গ্রহণ করে ভারত ও বাংলাদেশ। সেইমতো দিনক্ষণও চূড়ান্ত হয়। কিন্তু যেটা সব থেকে বিস্ময়ের তা হল, জনগণনাকে কেন্দ্র করে ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় কমিটির সহসা সক্রিয় হয়ে ওঠা। তার থেকেও অবাক করল বাংলাদেশ সরকার। বলা ভাল, স্থানীয় প্রশাসনের একাংশ এ ব্যাপারে তাদের যেভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করল তা দেখে। অর্থাৎ ঘটল এটাই— বাংলাদেশের অভ্যন্তরস্থ ভারতীয় ছিটমহলগুলিতে বাংলাদেশ প্রশাসনের অনুপস্থিতিতে এবং প্রত্যক্ষ মদতে ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় কমিটির দাদাগিরি। প্রকৃত অর্থে একটি মাফিয়ারাজ চক্রের রাম-রাজত্ব। আর সেই রাজত্বে এবার জনগণনা।

১৪ জুলাই ২০১৫ শনিবার ভারতের ৯৬ জনের গণনাকারী একটি দল চ্যাংড়াবান্ধা সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে সে দেশের কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলকামারি ও পঞ্চগড় জেলার অভ্যন্তরে থাকা ১১১টি ভারতীয় ছিটমহলে যায়। সমগ্র এলাকাটি একেবারেই অচেনা ও অজানা হওয়ার কারণে ওই দলের পথপ্রদর্শক হয় বাংলাদেশের সরকারি কর্মীরা। আর তাদের নির্ভরও করতে হয় ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় কমিটির সদস্যদের উপর। এর ফলে বেছে বেছে তাদের বিরোধী সদস্যদের নাম জনগণনা থেকে বাদ দেওয়া থেকে শুরু করে প্রকৃত ছিটবাসীদের নাম একেবারেই মুছে ফেলার মতো এক সুনিপুণ ব্লুপ্রিন্ট প্রণয়ন হল।

হ্যাঁ ঠিক, এমনটাই ঘটেছিল ২০১১-র জনগণনায়, যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ১১২ নং বাঁশকাটা ছিটমহলের বলরাম বর্মন। এরকম বহু মানুষ আছেন, যাঁদের ছিট ভূখণ্ডে জমির প্রাচীন নথিপত্র রয়েছে, কিন্তু তাঁদের সুচারুভাবে জনগণনা থেকে বাদ দেওয়া হল। আর তাঁদের নামের জায়গায় জনগণনায় নাম নথিভুক্ত করানো হল তাদের, যারা জমি দখল করে রয়েছে। ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় কমিটির আড়ালে ভূমিদস্যুদের মূল কাজের মধ্যে এটি অন্যতম এবং এ কাজে যে তারা অনেকটাই সফল তা অনায়াসেই বলা যায়। সেই সঙ্গে ভারত সরকারের বাংলাদেশ সরকারের উপর অত্যধিক নির্ভরতা ও অগাধ আস্থা যে বহু ভারতীয় ছিটবাসীর জীবনে অন্ধকার নামিয়ে এনেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ছিটমহল ভূখণ্ডের প্রকৃত রায়তদের চিহ্নিত করা হল না। আর তা না করেই একটি প্রতিবেশী দেশের সরকারের প্রশাসনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা হল। শুধু তা-ই নয়, একদিনে ঝটিকা বাহিনী পাঠিয়ে ছিটবাসীদের সুলুকসন্ধান করা হল। একে কি একটি অবিবেচনাপ্রসূত কাজ ছাড়া অন্য কিছু বলা যায়? কিন্তু তার মাশুল গুনতে হচ্ছে হাজার হাজার ভারতীয় ছিটবাসীকে। সব থেকে বড় কথা, রাজন্যশাসিত কোচবিহারের শাসনব্যবস্থায় ছিটমহলগুলিতে যাঁরা জমির নথিপত্রসহ বসবাস করতেন, স্বাধীনতা-পরবর্তী পর্বে যাঁদের বিভিন্ন সময়কালে নিজ নিজ ছিট ভূখণ্ড থেকে উৎখাত হয়ে মূল ভূখণ্ডে আশ্রয় নিতে বাধ্য করা হয়েছে, তাঁদের এই জনগণনায় সম্পূর্ণভাবেই ব্রাত্য করে রাখা হল। জমির উপর তাঁদের অধিকার পারতপক্ষে করা হল অগ্রাহ্য। অন্তত আপাতদৃষ্টিতে অভিযোগ সেটাই। ছিটবাসীদের সংগঠনগুলির বক্তব্যও তা-ই।

ছিটমহলগুলিতে জনগণনার অব্যবহিত পরেই ভারতের কোচবিহার জেলার বিভিন্ন গণসংগঠনের বক্তব্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে শুরু করে। কোচবিহারকেন্দ্রিক সামাজিক সংগঠন 'অ্যাসোসিয়েশন অব বেটার কোচবিহার'-এর সাধারণ সম্পাদক তথা কোচবিহারের বিশিষ্ট আইনজীবী আনন্দজ্যোতি মজুমদার শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত বহুল প্রচারিত এক দৈনিকে মন্তব্য করেন, 'ভারত সরকারের নির্দেশে রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় সম্প্রতি ছিটমহলগুলিতে যে জনগণনা হয়েছে তা ত্রুটিপূর্ণ। এই ছিটমহলগুলির প্রকৃত বাসিন্দারা বঞ্চিত থেকে গিয়েছেন। ত্রুটিপূর্ণ গণনাপদ্ধতির সুবাদে বহু বাংলাদেশি নাগরিক ভারতীয় ছিটমহলের বাসিন্দার পরিচয় দিয়ে অবৈধভাবে ভারতীয় নাগরিকের স্বীকৃতি পেয়ে যাচ্ছেন। ব্রিটিশ করদমিত্র রাজ্য কোচবিহারের মহারাজার প্রজারাই প্রকৃত ছিটমহলের বাসিন্দা এবং ভারতীয় নাগরিক। জনগণনার ক্ষেত্রে সরকারের উচিত ছিল ছিটমহল বাসিন্দাদের কাছ থেকে কোচবিহারের মহারাজার জমির দলিল ও নথিপত্র চাওয়া। যাঁরা মহারাজার আমলের কাগজপত্র, দলিল ইত্যাদি দেখাতে পারবেন, তাঁরাই হবেন প্রকৃত ছিটমহলবাসী এবং ভারতীয় নাগরিক। কিন্তু সদ্যসমাপ্ত জনগণনায় কোনও নথিপত্র চাওয়া হয়নি। বাসিন্দারা যা বলেছেন, গণনাকারীরা তা-ই লিখে নিয়েছেন। ফলে এই গণনার মাধ্যমে সঠিক তথ্য কখনও জানা সম্ভব হবে না।'

বিশিষ্ট আইনজীবী আনন্দজ্যোতি মজুমদারের আরও অভিমত, দীর্ঘ কয়েক দশক পর ছিটমহলের জনগণনা হল, অথচ কয়েক হাজার প্রকৃত ছিটমহলবাসীর নাম জনগণনায় স্থান পেল না। এঁদের মধ্যে বিভিন্ন সময়কালে বাংলাদেশের দুর্বৃত্তদের অত্যাচারে ছিটমহলের জমি, বাড়িঘর ত্যাগ করে সীমান্তের এপারে চলে আসা মানুষজনও রয়েছেন। সরকারও এদের খোঁজখবর করেনি।

> ২০১১ সালের জনগণনায় অধিকাংশ ভারতীয় ছিটমহলেই এই বাংলাদেশি দখলদাররা জাল ভারতীয় পরিচয়ের মাধ্যমে নাম তালিকাভুক্ত করে নিয়েছে।

একই অভিমত 'ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিল'-এর। ছিটমহলবাসীদের এই সংগঠন কোচবিহার জেলাশাসককে স্মারকলিপি দিয়ে বিষয়টির প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছে। সংগঠনের বক্তব্য, 'ভারতীয় ছিটমহলের বাসিন্দাদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে জমি, বাড়ি ফেলে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন ভারতের মূল ভূখণ্ডে। অন্য দিকে, বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা এই ছিটমহলগুলি দখল করে ছিট বিনিময়ের সুযোগ নিতে তৎপর হয়ে উঠেছে। ২০১১ সালের জনগণনায় অধিকাংশ ভারতীয় ছিটমহলেই এই বাংলাদেশি দখলদাররা জাল ভারতীয় পরিচয়ের মাধ্যমে নাম তালিকাভুক্ত করে নিয়েছে। ফলে ২০১১ সালের জনগণনা সম্পূর্ণভাবে ত্রুটিপূর্ণ। কোচবিহারের জেলাশাসকের মাধ্যমে ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি পাঠিয়ে ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিল প্রয়াসী হয়েছিল দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসকের কাছে বিষয়টি তুলে ধরতে।

ভারতীয় ছিটমহলগুলি থেকে বিতাড়িত ছিটবাসীদের অপর একটি সংগঠন 'ভারতীয় ছিটমহল উদ্‌বাস্তু সমিতি' বিভিন্ন সময়কালে একই দাবিতে বহুদিন ধরেই সরব। কোচবিহার জেলার হলদিবাড়িকেন্দ্রিক এই সংগঠন অনেকাংশেই ভারতীয় জনতা পার্টি প্রভাবিত বা বলা ভাল, বিজেপি সমর্থিত। এই সংগঠনের বক্তব্য, দীর্ঘ বছর ধরে ভারতীয় ছিটমহলের নটকটকা, কোটভাজনি, বেউলাভাঙা, কাজলদিঘি, শালবাড়ি, দহলা খাগড়াবাড়ি ইত্যাদি একাধিক ভারতীয় ছিটমহল থেকে বিতাড়িত মানুষজন ভারতীয় মূল ভূখণ্ডে উদ্‌বাস্তু জীবনযাপন করছে। তাদের ছিটমহলে জমি আছে। সাম্প্রতিককালে ছিটমহলগুলিতে আদমশুমারি হলেও তাদের নাম নথিভুক্ত হয়নি। ছিটমহলের আদমশুমারিতে এই সকল মানুষের নাম নথিভুক্ত হওয়া উচিত। ভারতীয় ছিটমহল উদ্‌বাস্তু সমিতি ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীকে সাংবাদিক সম্মেলন করে সমর্থন জানায়। বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারকার্যেও অংশ নেয়। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্‌মুহূর্তে বিজেপি দলের জলপাইগুড়ি জেলা নেতৃত্ব ছিটমহল থেকে বিতাড়িত উদ্‌বাস্তু মানুষদের আশ্বস্ত করেছিলেন এই বলে যে, তাঁদের প্রধানমন্ত্রী পদে সম্ভাব্য প্রার্থী নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসার পর তাঁদের দাবি বিবেচনা করে দেখবেন।

হলদিবাড়িকেন্দ্রিক অপর একটি সংগঠন 'ছিটমহল পিপল'স কমিটি' দীর্ঘ কয়েক বছর যাবৎ ভারতীয় ছিটমহলের উদ্‌বাস্তু মানুষজনের বিভিন্ন দাবিসমূহ প্রশাসনিক স্তরে পৌঁছে দিতে সক্রিয়। একটা সময় ছিল, যখন এই সংগঠনের প্রদত্ত পরিচয়পত্র নিয়ে হলদিবাড়ি থানার অধীনস্থ ভারতীয় ছিটমহলসমূহ, যথা— কাজলদিঘি, শালবাড়ি, নটকটকা, বেউলাডাঙা, কোটভাজনি, বালাপাড়া, খাগড়িবাড়ি, দহলা খাগড়িবাড়ি, গরাতি ইত্যাদি গ্রামের মানুষজন সীমান্ত পেরিয়ে মূল ভূখণ্ডে আসতেন। সীমান্তে প্রহরারত বিএসএফ জওয়ানরা ছিটমহল পিপল'স কমিটি প্রদত্ত পরিচয়পত্রকে যথেষ্ট মান্যতাও দিতেন। জনৈক বীরেন ঠাকুর এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। পরবর্তীতে ছিটমহলগুলিতে বাংলাদেশি দুষ্কৃতী কর্তৃক অরাজক অবস্থা সৃষ্টি হলে এই সংগঠনের অধিকাংশ কর্মকর্তা মূল ভূখণ্ডে পালিয়ে আসতে বাধ্য হন। ছিটমহল পিপল'স কমিটিও বিভিন্ন সময় হলদিবাড়ি বিডিও অফিসে ডেপুটেশন দিয়ে উদ্‌বাস্তু ছিটবাসীদের নাম আদমশুমারিতে অন্তর্ভুক্তির দাবি জানিয়েছে। অর্থাৎ এ কথা অন্তত অতি স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, ২০১১ সালে ভারতীয় ছিটমহলগুলিতে যে পদ্ধতিতে জনগণনা হয়েছে তা উত্তরাধিকারসূত্রে বসবাসরত প্রকৃত ছিটবাসীদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। এই কারণে ২০১১ সালের আদমশুমারি সম্পূর্ণ ত্রুটিপূর্ণ তা সংশ্লিষ্ট সকলেরই অভিমত।

এরকম এক পটভূমিতে 'পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশন'-এর এক ফুল বেঞ্চ কোচবিহারে আসে মানবাধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন অভিযোগের শুনানি করতে। ২০১৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বর কোচবিহার সার্কিট হাউসের অ্যানেক্স বিল্ডিং-এ কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি অশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়, কমিশনের সদস্য বিচারপতি নারায়ণচন্দ্র শীল, রেজিস্ট্রার রবীন্দ্রনাথ সামন্ত প্রমুখের উপস্থিতিতে শুনানিপর্বে ভারতীয় ছিটমহল ঐক্য পরিষদ ও ছিটমহল পিপল'স কমিটি যৌথভাবে ভারতীয় ছিটমহলবাসীদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এক পিটিশন দায়ের করে। ছিটমহল ঐক্য পরিষদ বা ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিল-এর পক্ষে বলরাম বর্মন এবং ছিটমহল পিপল'স কমিটির পক্ষে রফিকুল ইসলাম কর্তৃক স্বাক্ষরিত পিটিশনের শুনানিপর্বে ছিটবাসীদের কথা শুনে মাননীয় বিচারপতিগণ বিস্মিত হয়ে পড়েন।

দেবব্রত চাকী

(ক্রমশ)

প্রহেলিকার ডুয়ার্স

১

পটলরাম পর্যটকের ডায়েরি থেকে '১৬ই পৌষ, ১৪২২— ডুয়ার্সের আবহাওয়ায় প্রচুর পান জন্মাইয়া থাকে। তাই ডুয়ার্সে আসিলেই পান করিতে ইচ্ছা হয়। শিবরাম পান করিতেন। নজরুল পান খাইতেন বলিয়া তাঁহাকে পানাসক্ত বলা হইত। পানে আমার বেশি আসক্তি হেতু পানের ব্যাপারে আমাকে বেশ্যাসক্ত বলা চলে। পানকর্মে নদী মিশাইলেও নেশা জমিয়া যায়।'
ডায়েরি পড়ে আমি বটলকে বলি, 'কী বলতে চাও খুলে বলো তো?'
'কেন? একটা নদীর নাম!' পটল জানায়।
নদীর নামটাই এবারের প্রথম প্রহেলিকা।

২

গন্ডারের শিং আনবার জন্য একটা পোচারকে সুপারি দিয়েছিলাম। শিং দেওয়ার দিন দেখি ব্যাটা উলটো দিকে বেঁকে গিয়ে আমার কাছে শূন্য হাতে এল। বলল, 'গন্ডারটাকে তাক করে সবে গুলি ছুড়ব এমন সময় ব্যাটার লাভার এসে আমাকে পেছন থেকে এক গুঁতো! উঃ!'
আমি বললাম, 'সে কী? কোথায় হল?'
সে কোমরে হাত বুলিয়ে বলল, 'ওই যার টু থার্ড চচ্চড়ি বানিয়ে খেলে ভাল লাগে।'
বলেই সুপারি ফেরত দিয়ে ভ্যানিশ!
ব্যাটা যে কোথায় গিয়েছিল! আপনি জানেন?

গতবারের উত্তর— ১) বানারহাট, ২) লংকাপাড়া আর ঝালং, ৩) গোরুমারা

প্রথম সঠিক উত্তরদাতা—
জয়দীপ তলাপাত্র, জলপাইগুড়ি

ব্যাসকূট বসু

উত্তর পাঠান ই-মেল বা ডাক মারফত। সঠিক উত্তর ও উত্তরদাতাদের নাম ছাপা হবে আগামী সংখ্যায়। সেই সঙ্গে নতুন ধাঁধা পাঠাতে পারেন আপনিও। তবে তা অবশ্যই ডুয়ার্স সম্পর্কিত হতে হবে।

টিং টিং সাইকেল

ডুয়ার্সের অনেক স্কুলের সামনে এখন রাশি রাশি সাইকেল। কোথাও সাইকেল পেয়ে হাসিমুখে বালক-বালিকা বাড়ি ফিরছে, কোথাও না পেয়ে রাস্তা অবরোধ করে গাড়িঘোড়ার নাভিশ্বাস তুলে দিচ্ছে। স্কুলপ্রধানরা প্রবল চিন্তিত। রাশি রাশি সাইকেল জোড়া দিয়ে কীভাবে তুলে দেবেন ছাত্রছাত্রীর হাতে! এই মুহূর্তে সাইকেলের কাজ জানা ফিটার ডুয়ার্সে 'টু পাইস' রোজগার অনায়াসেই করতে পারেন। কারণ, রাশি রাশি সাইকেলের মতো গন্ডায় গন্ডায় ফিটার সত্যিই অমিল হচ্ছে।

ফিটার হলে যেমন লাভ, তেমনই ব্যবসায়ী হলে মুখ কালো। সাইকেলের এই স্রোতে সত্যিই ভেসে গিয়েছেন সাইকেল ব্যবসায়ীরা। দোকানভরা নতুন সাইকেল রোজ সকালে সাজিয়ে বিকেলে তুলে রাখতে হচ্ছে। আট-দশ হাজারি কেতার সাইকেল আর ক'টা বিকায়? এইভাবে হাজারে হাজারে সাইকেল যদি ছেলেপুলের হাতে সরকার ফ্রি-তেই দিয়ে দেয়, তবে দোকানে ভিড় জমাবে ক'জন?

ফলে এই শীতের চলে যাওয়া পৌষ মাসটা তাঁরা ঠিক উলটো অর্থে টের পেয়েছেন। শোনা যায়, দানের সাইকেল নাকি দ্রুত বিগড়ে যায়। এটা শুনে অবশ্য সারাইওয়ালাদের মুখে হাসি ধরছে না। সাইকেল-বেচিয়েদের তাঁরা নাকি গ্যারেজ খোলার পরামর্শও দিচ্ছেন। সাইকেলের গ্যারেজই নাকি ডুয়ার্সের আগামী কর্মসংস্থান। আপাতত সাইকেল ব্যবসায়ীরা এই বলে নিজেদের সান্ত্বনা দিচ্ছেন যে, ওইসব সাইকেল একবার খারাপ হলে আর ঠিক হয় না। সুতরাং...।

গ্যাসকাঠ

না। এটা কোনও কাঠের নাম নয়। ডুয়ার্সের অরণ্যে জ্বালানি কাঠের জন্য লাগোয়া গ্রামগুলি থেকে মানুষ গাছের ডাল কাটে। ফলে নিচের দিকে গাছের ঘনত্ব কমে যায় আর জঙ্গলকে দেখায় ন্যাড়া। এ ছাড়াও আরও সমস্যা তো আছেই। এটা বন্ধ করার জন্য সরকার ঠিক করেছিল কাঠের বিকল্প জ্বালানি গ্রামবাসীদের সরবরাহ করবে। সেই কারণে বৈকুণ্ঠপুর অরণ্যের ললিতাবাড়ি বিটের অরণ্যসুরক্ষাকর্মীদের গ্যাসের উনুন আর সিলিন্ডার বিলি করা হল। সাধু উদ্যোগ! সহজে গ্যাস পেয়ে গেলে নিশ্চয়ই জঙ্গলে জ্বালানি কাঠের জন্য আর ঢুকবেন না গ্রামের মানুষ।

বাড়ির চুলো ধরাবার কারণে গাছের ডাল কাটা না হয় বন্ধ করার একটা উপায় হল, কিন্তু রান্নার দরকার না থাকা সত্ত্বেও যারা গোটা গাছ কেটে নিয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে, তারা ক্ষান্ত হবে কোন সিলিন্ডারে? এমন তো নয় যে, বাড়িতে চুলোয় আগুন দিতে গিয়েই স্থানীয় মানুষরা অরণ্য ফাঁকা করে ফেলেছেন! কারা আস্ত আস্ত বৃক্ষ কোন চুলোয় পাঠাচ্ছে, সেটা নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর কিছু বলুন আর করুন! আমরা কান পেতে, ক্যামেরা বাগিয়ে রেডি!

বনে হবে বাঘ

ডুয়ার্সের অরণ্যে আরও বাঘ হবে। অবশ্য আরও বললে ব্যাকরণে ভুল হয়, কারণ উক্ত ভূখণ্ডের অরণ্যে বাঘমামা এক পিসও আছে নাকি তা নিয়ে খুব সন্দেহ পশুপ্রেমীদের। কিন্তু রাজ্যের বন মন্ত্রী বলেছেন, 'আরও আরও আরও চাই বাঘ।' খুব কঠিন কাজ। বাঘ তো আলু নয় যে বীজ পুঁতে দিলেই গজাবে। বাঘের ছানায় অরণ্য ভরতি করতে হলে চাই বাঘ-মা আর অবশ্যই বাঘা-বাপ। গোড়াতেই একজোড়া হ্যাপি বাঘ কাপ্‌ল খুঁজে আনতে হবে। সুন্দরবনের বাঘাদের আবার ডুয়ার্সের পরিবেশ পছন্দ হবে কি না তা জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। তা ছাড়া একটা বাঘা-বাপ আর কত লড়বে? কেউ কেউ অবশ্য মিচকে হেসে বলছে, বাঘাদের জন্য স্যাটেলাইট ক্যাপসুল কি চাইনিজ তৈল পাওয়া গেলে ভাল হত। আমরা অবশ্য এসব চিমটি কাটায় বিশ্বাস না করে মন্ত্রীমশাইয়ের আশায় ঘি ঢালছি। একদা রাশি রাশি বাঘার আবাসভূমি আবার হালুম হুলুম শব্দে ভরে উঠুক। তবে অরণ্যের যা দশা হচ্ছে বাপ! বাঘারা যদি আবার নতুন করে গজায়, তবে গেরস্তের গোরু-ছাগল নিয়ে টানাটানি করবে না তো?

ঘণ্ট কম্পিটিশন

ফালাকাটা ব্লক কৃষি মেলার শেষ দিন দুর্দান্ত জমে গেল। আইডিয়াটা কার মাথায় এসেছিল ঠিক জানা যাচ্ছে না, কিন্তু ফল হল জমজমাট!। সরকারি তরফে হঠাৎ জানানো হল যে, মেলার শেষ দিন হবে রান্না কম্পিটিশন। বিষয়, বাঁধাকপির ঘণ্ট। ডুয়ার্সের বাজারে এখন রাশি রাশি বাঁধাকপি প্রায় জলের দরে বিকাচ্ছে। ফলে প্রতিযোগিতা চালাতে পকেটে টান পড়বে না তেমন। হলও তা-ই। ১৬ জানুয়ারি বেলা দ্বিপ্রহরান্তে দেদার প্রতিযোগী কোমর বেঁধে মেলার শেষ দিন

লেগে পড়লেন ঘন্ট রাঁধতে। মেলাস্থল সুবাসে আমোদিত হল। চল্লিশ মিনিট সময়সীমার মধ্যে দিব্যি ঘন্ট রেঁধে প্লেটে সাজিয়ে ফেললেন ডজনখানেক প্রতিযোগী। তারপর প্রথম-দ্বিতীয় ইত্যাদি ঘন্ট চেখে বিচারকরা ঘোষণা করলেন, কোনও ঘন্টই নাকি উপেক্ষা করা যাচ্ছিল না। এসব দেখতে ফালাকাটার কালীবাড়ি ময়দানে হাজির দর্শকদের জিবের জলে নাকি মাঠের ঘাস ভিজে গেছে!

যাচ্চলে

একদা ডুয়ার্সের এক টোটোচালক বলেছিলেন, 'আপনি যদি আমার টোটোকে নিজের বলে দাবি করেন, তবে আমি প্রমাণই করতে পারব না সেটা আমার। বুঝলেন? টোটো চুরি করা সবচাইতে সোজা!'

তখন খুব একটা তলিয়ে ভাবিনি। কারণ বাইক-গাড়ি— এসব চুরি হলেও টোটো চুরির কথা কানে আসেনি মোটেই। কিন্তু এবার সেটাও শুরু হয়ে গেছে। টোটো হারিয়ে বেচারা চালক থানায় গিয়ে বিশেষ কিছুই জানাতে পারছেন না। পুলিশ নাকি বুদ্ধি দিচ্ছে টোটোর বিভিন্ন অংশে মার্কার দিয়ে নাম লিখে রাখতে।

যাব্বাবা!

ধীর ডুয়ার্স

ডুয়ার্সের জীবনযাত্রা খুব একটা গতিশীল নয়। দাঁতে দাঁত চেপে দৌড়ানোর ব্যাপারটা কম।

অবসরের অবকাশ একটু বেশি। ডুয়ার্সে ইতিউতি ঘুরে বেড়ালে কর্মচাঞ্চল্যের পাশাপাশি আলস্য, গজেন্দ্রগমন, ঘুম ইত্যাদি বিষয়ও সমান তালে হাজিরা দেয়। ডুয়ার্সের বহু অঞ্চলই সন্ধের পর সব শুনশান। ছোট ছোট বাস স্টপ বা বাজারের কিছু খুচরো আড্ডা আর সামান্য বিকিকিনি ছাড়া অধিকাংশ লোকই তখন ঘরে। অনেক জায়গায় সন্ধের পর যাওয়ার বা ফেরার কোনও গণপরিবহণ নেই। আটকে গেলে নিজের ব্যবস্থা ছাড়া ফেরা অসম্ভব। ডুয়ার্সের ছোট ছোট গ্রামের বারো আনা মানুষ এখনও রাত আটটার মধ্যে অগাধ ঘুমে ডুব দেয়। হাতে গোনা কয়েকটা শহর ছাড়া এটাই ডুয়ার্সের গড়পড়তা জীবনগতি। তাই ডুয়ার্সে ঘোরাঘুরি করতে গিয়ে কাউকে কাজ পাশে সরিয়ে রেখে ঘুমিয়ে পড়তে দেখলে অবাক হতে নেই। একটু খোলা প্রকৃতির কোলে কাউকে সুখনিদ্রায় মগ্ন থাকতে দেখলে হিংসে করতে নেই। ডুয়ার্সের শীত, বর্ষা, বসন্ত, গরম— যে কোনও ঋতুতেই ঘুমদেবী সজাগ। সেই দেবীর আশীর্বাদপ্রাপ্ত একজনের ছবি।

ভুটানি নোট

বছর তিনেক আগেও ডুয়ার্সে কারবার চলত ভুটানি নোটে। ভারতীয় নোটের দেখাই মিলত না প্রায়। চা খেয়ে দেশীয় দশ টাকার নোট দিলে পাঁচ টাকা ফেরত আসত ভুটান নোটে। বেসরকারি প্রায় সব ক্ষেত্রেই অবারিত ছিল ভুটান টাকার আনাগোনা। এ নিয়ে অবশ্য প্রতিবাদও উঠত নানা মহল থেকে। তবুও প্রায় এক দশক ভুটানের টাকা দেশের ডুয়ার্স ভূখণ্ডে চুটিয়ে রাজত্ব করেছে। তারপর ২০১২-র মার্চ মাস নাগাদ তা বন্ধ হয় ভুটান সরকারের একটা বিজ্ঞপ্তির কারণে। বিজ্ঞপ্তিতে ছিল, ভুটানি ব্যাঙ্কে ভারতীয়দের আর কোনও অ্যাকাউন্ট রাখা হবে না। এর ফলে বিদেশি টাকার লেনদেন বজায় রাখা অসাধু চক্রের বাধ্যতামূলক অবসান ঘটে। কিন্তু ততদিন ডুয়ার্সের বহু ব্যবসায়ীর ট্যাঁকে জমে গিয়েছে মেলা ভুটানি টাকা। সেসব টাকা এতদিন অচল হয়ে শোভা পাচ্ছিল ব্যক্তিগত সিন্দুকে। সম্প্রতি সেসব ভারতীয় মুদ্রায় বদলে নেওয়ার সুযোগ এল। ভুটানে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকরা ভুটানি নোটে মজুরি পেলেও আর সমস্যা হবে না। কারণ, ভুটান আবার তাদের ব্যাঙ্কে থাকা ভারতীয়দের অ্যাকাউন্ট চালু করছে। ভুটানের ব্যাঙ্কগুলি থেকে ভারতীয় টাকায় ড্রাফ্টও কাটা যাবে এখন। তবে আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে এই ঘটনায়। আবার ডুয়ার্সে বিকিকিনি করতে গিয়ে বাধ্য হয়ে ভুটানি টাকা নিতে হবে না তো? আবার সেই অসাধু ব্যবসায়ী চক্র কোমর বেঁধে নেমে পড়বে না তো?

গন্ডারের আলুবাজি

না না! মোটেই খারাপ অর্থে নেবেন না! 'আলুবাজি' বলতে যা বোঝায়, গন্ডাররা সেসব মোটেই করে না। প্রেমে পড়ে ধুন্ধুমার মারপিট করে ঠিকই, কিন্তু ওসব মনুষ্যজনোচিত কর্মে তাদের মোটেই আগ্রহ নেই। আসলে হয়েছে কী, জঙ্গলে ঘাসপাতা খেয়ে অরুচি ধরে যাওয়ায় এক ছেলে-গন্ডার একটু শখ করে গোরুমারার অরণ্য থেকে লোকালয়ে এসেছিল আলু খেতে। নাগরাকাটা ব্লকের কলাবাড়ি গ্রামের কাছে আধাবেলায় মাত্র কয়েক বিঘে জমির আলু উদরস্থ করে ব্রেকফাস্ট করেছিল মাত্র। তাতেই এখন হইচই যে, লাঞ্চে আরও কয়েক বিঘে সাবাড় করার ইচ্ছে ত্যাগ করেই ফিরে গিয়েছে আস্তানায়। এমনিতে হাতি এসে মিডডে মিলের চাল থেকে শুরু করে হাড়িয়া আর লবণ খেয়ে যেত এতদিন। গন্ডাররা মাঝে মাঝে লোকালয় ভ্রমণে এলেও বিশেষ কিছু চেখে দেখত না। সম্ভবত হাতিদের কাজে উৎসাহ পেয়ে আলু খেয়ে গেছে। কিন্তু এক গন্ডারেই যদি বিঘে পাঁচেক সাবড়ে দেয়, তবে এরকম বন্ধুবান্ধবসহ এলে ডুয়ার্সের মানুষের খাওয়ার জন্য আলু কি আর থাকবে গো!

কুয়াশারাদিন

মানে সারাদিন কুয়াশা। দু'-চার ঘণ্টা একটু পরিষ্কার। এ ছাড়া দিনের বাকি ঘণ্টা সব ছায়া-ছায়া। শীতকালে এটাই সংক্ষেপে ডুয়ার্সের ছবি। যদিও আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে কুয়াশার সেই আধিপত্য অনেকটা

কমেছে। তবুও সকালে সূর্যের মুখ দেখতে পাওয়া এখনও কঠিন। আরও পনেরো-কুড়ি দিন এমনই চলবে। দুপুরের আগে রোদ্দুরের চেহারা থাকবে মিইয়ে যাওয়া মুড়ির মতো। অবশ্য এই কুয়াশাময় ঠান্ডাই যে ডুয়ার্সের শীতের একটা মজা, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। অসুবিধে হলেও।

ছবি: অমিতেশ চন্দ

চোখের বাহিরে...

ভাঙা আয়নায় টুকরো ডুয়ার্স

সনৎদা আমার হাত চেপে ধরলেন। লেপে ঢাকা গা। হাত দুটো গরম। ‘কে এসেছিস?’ তেমনি জলদগম্ভীর গলা। তাঁর কাছে আসব বলেই ধূপগুড়ি থেকে শীত-সকালে বাইক চেপেছি। রোদ মাখতে মাখতে গয়েরকাটা চা-বাগান পেরিয়ে বীরপাড়ার পথ ধরেছি। মাদারিহাট পৌঁছে বনের শরীর ঘেঁষে একটু দাঁড়িয়েছি। তারপর আবার একটানা বাইকিং। হাসিমারা আসতেই ভূগোলটা কেন যেন অন্যরকম হয়ে যায়। ডুয়ার্স, অথচ একটু আলাদা। ভুটান-ভুটান টান বলেই কিনা কে জানে। হ্যামিলটনে কোনওবার কালীপুজোর মেলায় আসা হয়নি। কিন্তু আজ বাসরা নদীর বুকের উপর দিয়ে বাইক ছুটিয়ে হ্যামিলটন বাজারে ঢুকে পড়লাম। সনৎদা টানছেন যে। আর একটি ছোট্ট মেয়ে, কবিতা বলে। যার হোয়াটস অ্যাপ স্টেটাসে লেখা— যতই সমস্ত আকাশ জুড়ে মেঘ বলাকার ছবি আঁকি না কেন, তবু আমার সব আঁচড়ে ঘিরে কবিতা হয় না কেন? ও কি সনৎদার কোনও কবিতা পড়েছে? হয়ত না। তবু এই ভূগোলে থেকে ও কবিতাতেই আশ্রয় খুঁজছে! জানি, ‘এখন ডুয়ার্স’-এর প্রধান সম্পাদক বলবেন, ‘কবিতা নয় রে। গদ্য, গদ্য!’ তবু শীত-সকালে কবিতার টানেই আমার বাইক থেমে পড়ল একটি ছোট্ট সাইকেলের দোকানের সামনে। মুঠোফোনে বলেছিলাম, ‘আসছি।’ পৌলোমী দাঁড়িয়ে ছিল বাবার দোকানের সামনে। এক নিমেষে ওর ছোট্ট ঘরটায়। পাঠানকোটে তখন যুদ্ধ চলছে। আর পৌলোমী আমাকে শোনাতে লাগল ‘ফিরোজা আমি এক ভারতীয় মেয়ে।’ ওর ল্যাপটপে আই.এ.এস. পরীক্ষার নোটপত্তর। দেয়ালে টাঙানো গিটার। মেঝেতে ডুগি-তবলা। চেয়ারে হারমোনিয়াম। মা রান্না করে ফেললেন ছোট মাছের চচ্চড়ি। বাসরা নদীর মাছ! বাবা বললেন এখানকার সমন্বয়ের গল্প। আর মেয়ে শোনাল কবিতা। আমায় বলল, ‘তুমি কবিতা শোনাও।’ আমার চোখ চলে যায় চা-বাগানের দিকে। এই মানচিত্রের কত গল্প সনৎদার কাছে শুনেছি। তিনি আমাকে বলেছিলেন, ‘সারাদিন আমি মুনিয়া পাখি হয়ে উড়ি, রাতে বাদুড় হয়ে ছুঁয়ে থাকি চটের শিলিং, কতবার যে জন্ম হল— মৃত্যুও কতবার!’

আবার সনৎদাই আমাকে শুনিয়েছিলেন এই জনপদের কষ্টের কথা, ‘চা-বাগানে পায়ে চলা পথে দু’পাশের সবুজ ঘাস যন্ত্রণায় কাঁদে সভ্যতার আমদানি গ্যামাক্সিন বিষে, চা-গাছের বুকে ইউরিয়া...’।

পৌলোমী সনৎদার কবিতা পড়েনি। কীভাবে পড়বে? ডুয়ার্সের কবিদের বই কোন বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়? কবি নিজে না ছাপলে কে ছেপে দেবে! বন্ধ বাগানে আগাছা যেমন দখল নেয় ফ্যাক্টরির, তেমনি ডুয়ার্সের কত কবি বিস্মৃতির বনজঙ্গলে চাপা পড়ে যান। তাঁদের ঘরে শুধু দু’-একখানা সার্টিফিকেট ঝোলে। বিবর্ণ হয় ক্রমে। যেমন সনৎদার চা-বাগানের কোয়ার্টারের দেয়ালে ঝুলছে। ডুয়ার্সরত্ন খেতাবের অনুকম্পা! সার্টিফিকেট, অথচ প্রাপকের নাম নেই। যে কেউ চালিয়ে দিতে পারে নিজের বলে! একজন বললেন, ‘ডুয়ার্সরত্ন ঝাঁকে ঝাঁকে শেষ মুহূর্তে বাছা হয়। সার্টিফিকেটগুলো তৈরি থাকে। নামের কী দরকার? দিয়ে দেওয়া গেলেই হল। ফোনে ডেকে নেওয়া যাবে। রত্ন রত্ন পেয়ে বিগলিত হবেন!’... হায় রে, সম্মান!

সনৎদাকে হ্যামিলটন-কালচিনির আকাশ-বাতাস চেনে। গাঙ্গুটিয়ার গাছপালা জেনেছিল এ কী রত্ন। ডুয়ার্সরত্নে তাঁর কী যায়-আসে!

উৎসবগুলো যেন কেমন হয়ে যায়! অবাক লাগে। আগে দেখতাম— ঢাকঢোল পিটিয়ে তিস্তা-গঙ্গা উৎসব হত। গঙ্গার ওপারের শিল্পীরা উত্তরবঙ্গে এসে গাইতেন, কবিতা বলতেন, নাটক, নাচ হত। তাঁরা মোটা অঙ্কের সাম্মানিক পেতেন। আদিখ্যেতাও। পত্রিকায় তাঁদের নাম ছাপানো হত। অথচ তিস্তাপারের শিল্পীরা কাঁচুমাচু হয়ে যেতেন, কোথাও নাম ছাপানো হত না, নিজেরটা তো দূরস্থান— হ্যান্ডসদের টাকা জোটাতে কালঘাম ছুটে যেত। অথচ নাকি শিল্পে শিল্পে মেলবন্ধন!

এখন জমজমাট চলছে উত্তরবঙ্গ উৎসব। আনন্দের কথা। উত্তরবঙ্গ নাকি হাসছে! পত্রিকায় ফুল পেজ বিজ্ঞাপন অথচ উত্তরবঙ্গের শিল্পীদের নাম নেই! কলকাতা দিয়ে ভরপুর উত্তরবঙ্গ উৎসব! উত্তর-দক্ষিণ এক সাম্মানিক হয় না কেন? যাতায়াত ভাড়া আলাদা হতে পারে, কিন্তু সাম্মানিকটা তো এক হওয়া উচিত। অবাক লাগে।

এই পরিমণ্ডলে সনৎদার কবিতা যে পৌলোমী পড়বে না, সে তো হতেই পারে। আমরা পড়তে শেখাইনি তো! ওদের জেনারেশনের কোনও দোষ নেই।

স্টেশন বাঁ দিকে রেখে একটা রেলওয়ে ক্রসিং পেরিয়ে ধরলাম গাঙ্গুটিয়ার পথ। সবুজ আর পথের ধুলো মিলেমিশে একাকার। অবিকল সেই কোয়ার্টারটা। এর উঠোনে এক সময় দাপিয়ে সনৎদা রিহার্সাল করাতেন আদিবাসী নাটক ‘রৌরেমন’। এই কোয়ার্টার নিয়ে তিনি লিখেছিলেন— আমার দরজায় কলিং বেল নেই, শালিক টিয়া ময়না দল বেঁধে আসে আমার দরজার সামনে, মাধবীলতার ডালে দোল খায়, ডাকে— সনৎবাবু, সনৎবাবু!

আমি তাঁর ঘরে ঢুকতেই তিনি টের পেলেন। একদম দেখতে পান না। হাত ধরে বললাম, ‘কেমন আছেন?’ গলা শুনেই বুঝে নিলেন।

বললেন, ‘অনেকদিন কবিতা লিখিনি বলে মনে বড় ক্ষোভ, বড় বেদনা।’ গেয়ে উঠলেন শচীনদেবের গান— বিরহ যে এত ভাল, জানিতাম না আগে। বললেন, ‘তোর সঙ্গে এই যে এতদিন পরে দেখা হল— এও একটা বিরহ!’ এখান থেকে আবার চলে গেলেন রবীন্দ্রনাথে, ‘এই কথাটি মনে রেখো, আমি যে গান গেয়েছিলেম...।’ সনৎদার অন্ধ চোখ জলে ভরে এল।

আদিবাসী রমণীর বুকের দুধ খেয়ে মাতৃহীন সনৎদা বড় হয়েছিলেন। আমায় সেই কতকাল আগে বলেছিলেন, ‘আমি পদবিতে চট্টোপাধ্যায় হলে কী হবে রে, আমি তো আসলে আদিবাসীই।’

মনে পড়ে, আমার ধূপগুড়ির বাসায় সনৎদা এক মধ্যরাতে হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে গেয়েছিলেন, ‘আমি চা-বাগানের মংরা/ বাঘের পেটে জীবন দিয়ে আমরা কেটেছি জঙ্গল/ সবুজ পাতা আজ সবুজ সোনা/ আমাদের কোথায় মঙ্গল?/ বেড টি হাতে আমার কথা কতটুকু ভাবো তোমরা?’ আজও গেয়ে উঠলেন। গান থামলে জানতে চাইলাম, ‘অনেককাল আগে লেখা আপনার গানটি তো আজও নির্মমভাবে সত্য।’ একটা বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলে সনৎদা বললেন, ‘কাজ করিয়ে টাকা দিয়েছে। কিন্তু কোনও মমতা ছিল না। তিন পুরুষের উপার্জন করে নিয়েছে ওরা চা-বাগান থেকে। আজ তাই নির্দয়ভাবে বাগান বন্ধ করে দিতে হৃদয়ে লাগে না।’

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, ‘তুই অনেক দূর যাবি বাইকে, সন্ধে হয়ে আসছে। যা, চলে যা।’ তারপর শূন্যের দিকে তাকিয়ে কবিতা মুখে মুখে লিখতে লাগলেন। যেতে হবে জেনেও মন যেতে চায় না। কেন যাব আমরা এই স্বপ্নময় দেশ থেকে?

পথিক বর

ধারাবাহিক কাহিনি

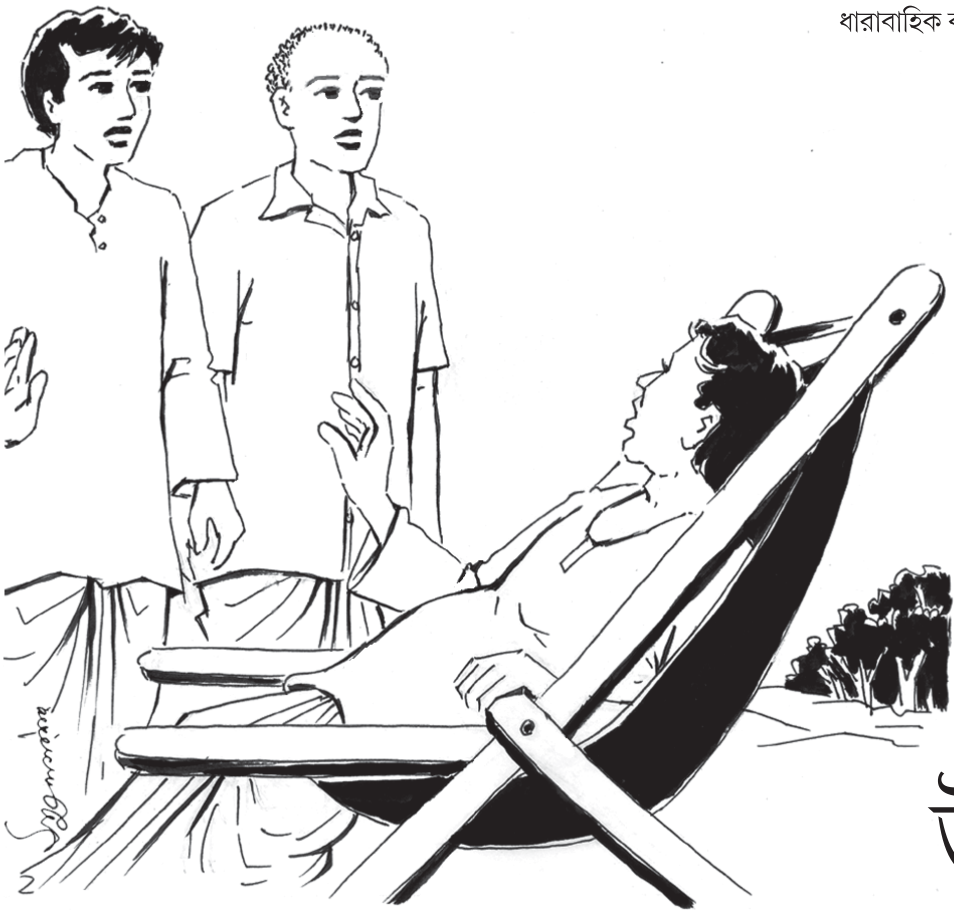

তরাই উৎরাই

১৮

সুবোধ শর্মার বাড়ি অনেকেই চেনে। আসলে এই ছোট টাউনে সকলেই বোধহয় সকলকে চেনে। পান্ডাপাড়া গ্রামে শর্মাদের প্রচুর প্রভাব-প্রতিপত্তি। ওড়িশা থেকে পান্ডা এনে এখানে বসিয়েছিলেন বৈকুণ্ঠপুরের রাজারা। তাঁদের পরিচয়েই পান্ডাপাড়া গ্রামের পরিচয়। সে কারণে প্রতিপত্তি তো থাকবেই। সুবোধ শর্মা সেই পান্ডাদেরই বংশধর। জ্ঞাতিভাইদের মতো ভূসম্পত্তি না থাকলেও এই মুহূর্তে হিদারু আর গগনেন্দ্র তাঁর বাড়ির আশপাশে যত দূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিল, সবই সুবোধ শর্মার। পাকা মেঝে আর সিমেন্টের ডাবওয়ালের উপর টিনের চাল বসানো তিন বাড়ি পেল্লায় উঠোনের তিন কোণে। আরেকটা কোণ দিয়ে বেশ খানিকটা বাগান পেরিয়ে ঢুকতে হয় বাড়ির উঠোনে। ঢোকার মুখে একটা আরামকেদারায় আধশোয়া হয়ে সুবোধ শর্মা বিদ্যাপতির পদ গাইছিলেন গুনগুন করে। তাঁর পাট পাট করে আঁচড়ানো চুল আর ধবধবে ফরসা রং দেখলে মনে ভক্তি আসে। তবে সুবোধ শর্মা নাকি ততটা আস্তিক নন, যতটা পান্ডাদের উত্তরসূরি হিসেবে তাঁর হওয়ার কথা ছিল। পদ গাইতে পছন্দ করেন।

গাড়ি থেকে দু'জনকে নামতে দেখে সুবোধ শর্মা কৌতূহলী হয়েছিলেন। টাউনের খবর-সবর তিনি সবই রাখেন। হিদারুকে চিনলেও গগনেন্দ্রকে তাঁর আগন্তুক মনে হল। গুনগুন থামিয়ে তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন এগিয়ে আসা মানুষ দুটোর দিকে। অবশ্য তাকিয়ে থাকার ব্যাপারে একা ছিলেন না তিনি। সুবেশ গগনেন্দ্রকে দেখে অনেকেই তাকিয়ে থাকতে শুরু করেছিল তখন। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হিদারুর অস্বস্তি হচ্ছিল একটু। গগনেন্দ্র নামক সদ্যপ্রাপ্ত ধাঁধাটির পুরো সমাধান তখনও খুঁজে পায়নি হিদারু।

গগনেন্দ্র গটগট করে হেঁটে আধশোয়া সুবোধ শর্মার পায়ের পাতা স্পর্শ করে প্রণাম করে ফেলল পলকের মধ্যে। ফলে আরামকেদারায় সোজা হয়ে বসতে চাইলেন সুবোধ শর্মা। কিন্তু জুত না পেয়ে কেদারা ত্যাগ করে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে গগনেন্দ্রর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আয়ুষ্মান ভব! কিন্তু তোমাকে ঠিক চিনলাম না তো? তুমি কি গানুর ছেলে?'

—আমার নাম গগনেন্দ্র মিত্র। মাথাভাঙার...।

—আরে হ্যাঁ! গগনেন্দ্রকে থামিয়ে দিয়ে সুবোধ শর্মা উদ্ভাসিত মুখে বললেন, 'বোসো বোসো। হিদারুকে চিনলে কীভাবে? তুমি কি দিদির কাছে এসেছিলে? বাবার খবর কী? দাদারা এসেছিল কেউ এর মধ্যে?'

গগনেন্দ্র হাসিমুখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিচ্ছিল। হিদারু শুনছিল আর একটু একটু করে চিনছিল তাঁকে। বাড়ির উঠোনের প্রবেশপথে সুবোধ শর্মার আরামকেদারার মুখোমুখি অংশ চুন-সুরকি দিয়ে বাঁধানো। দু'জন সেখানেই বসেছে। উত্তর পেয়ে সুবোধ শর্মা এবার পুনরায় আধশোয়া দশায় ফিরে গিয়ে হিদারুর দিকে মনোযোগ দিলেন।

—তোমার কে গেল হিদারু?

—বাবা।

—তুমি কি পঞ্চানন ঠাকুরের বিধান মেনে পইতে নিয়ে ক্ষত্রিয় হয়েছ বাবা?

—আজ্ঞে না।

—তবে দোষ হবে না।

—আজ্ঞে?

—আমি তোমাদের দই আর মন্ডা দিয়ে মেখে মুড়কি খাওয়াব বুঝলে? স্নেহের সুরে বললেন সুবোধ শর্মা, 'ক্ষত্রিয় হলে তুমি কি এক বছর বাইরে খেতে পারতে না? হওনি তাই দোষ হবে না। আমার মতে না হয়ে ভালই করেছ। এসব করে কী লাভ?'

গোয়েন্দা আর অ্যাডভেঞ্চারের গল্পে যে উত্তেজনার তিলমাত্র সে আঁচ করতে পারেনি, উপেনের হয়ে জলপাইগুড়িতে অভিনয় করতে এসে প্রতি পদক্ষেপে তা ভালভাবেই অনুভব করেছে গগনেন্দ্র। টাকা তাকে প্রথম দিনই দিয়ে দিয়েছিলেন খুদিদা। উপেনকে নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করেননি। খাতিরযত্নে অস্থির করে দিয়েছিল গগনেন্দ্রকে তাঁর পরিবার। মনে মনে খুশিই হয়েছিল গগনেন্দ্র।

গগনেন্দ্র হেসে ফেলল। সে জানে সুবোধ শর্মা খাদ্যরসিক ব্যক্তি। সবার আগে কী খাওয়া যায় তা নিয়ে নিমেষে ভেবে ফেলেন।

এর পর কিছুক্ষণ নীরবতা। কথাটা তাকেই তুলতে হবে, সেটা বুঝতে পেরে গগনেন্দ্র নীরবতা ভঙ্গ করে বলল, 'উপেনের সঙ্গে সে দিন হিদারুই ছিল।'

—বুঝতে পেরেছি। মাথার উপর ঝাঁকড়া হয়ে থাকা তেঁতুল গাছটার দিকে তাকিয়ে একটু অন্যমনস্কভাবে বললেন সুবোধ শর্মা, 'উপেন এখন কোথায় আছে?'

—সেটা জানি না। শেষ চিঠি ডাকে দিয়েছে কালচিনি থেকে।

—ব্যাপারটা ঠিক হচ্ছে না বাবা। নরম স্বরে বললেন তিনি। 'ছেলেখেলার ব্যাপার নয় এসব। খুদির সঙ্গে তুমি দেখা করেছ নাকি?'

—এর মধ্যে কয়েকবার বাড়িতে গিয়েছি উপেনের নামে আসা টাকাগুলো নিতে। বলেছি ব্যবসায় নেমেছে। টাকা লাগবে। উপেনের চিঠিও দেখিয়েছি।

—খুদি বিশ্বাস করল তোমার কথা? বেশ বিস্ময় নিয়ে গগনেন্দ্রর দিকে তাকিয়ে বললেন সুবোধ শর্মা, 'মেনে নিল?'

—টুকটাক প্রশ্ন করেছিল। মনে তো হয় বিশ্বাস করেছে।

—টাকা দিয়ে দিয়েছে?

গগনেন্দ্র মাথা নাড়ল। উপেনের সঙ্গে সুবোধ শর্মার আলাপ হয়েছিল। এই বাড়িতে এসে সে গল্পও করে গেছে কয়েকদিন। হিদারু এখন বুঝতে পারছে যে উপেনের পরিকল্পনা সম্পর্কে সুবোধ শর্মারও ধারণা আছে। কিন্তু তিনি গগনেন্দ্রর পরিবারকে বিশেষ কারণে অনেকদিন ধরেই চেনেন, সেটা জানত না। জানার কথাও ছিল না। উপেনের মুখে সুবোধ শর্মার নাম শুনে গগনেন্দ্র ঠিক করে নিয়েছিল যে, দরকারে তাঁর সঙ্গেই আলোচনা করবে।

দরকার অবশ্যই পড়েছে এখন। গোয়েন্দা আর অ্যাডভেঞ্চারের গল্পে যে উত্তেজনার তিলমাত্র সে আঁচ করতে পারেনি, উপেনের হয়ে জলপাইগুড়িতে অভিনয় করতে এসে প্রতি পদক্ষেপে তা ভালভাবেই অনুভব করেছে গগনেন্দ্র। টাকা তাকে প্রথম দিনই দিয়ে দিয়েছিলেন খুদিদা। উপেনকে নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করেননি। খাতিরযত্নে অস্থির করে দিয়েছিল গগনেন্দ্রকে তাঁর পরিবার। মনে মনে খুশিই হয়েছিল গগনেন্দ্র। কিন্তু সেই খুশির ভিতর তিরতির করে বয়ে যাচ্ছিল এক বিস্ময়ের অনুভূতি। ইংরেজি পত্রিকার পাতা ওলটানো সেই পেলব অস্তিত্ব, সেই আলো-আঁধারে মাখামাখি ছায়ামুখ, সেই আন্দোলিত চলে যাওয়ার বিস্ময় মাঝে মাঝেই আবিষ্ট করে ফেলছিল তাঁকে। বারবার দেখছিল পর্দার ওপারে এক নীরব অথচ তীব্র উপস্থিতি। অদৃশ্য কিন্তু প্রবলভাবে মূর্ত।

ফেলে যাওয়া পত্রিকাটা কেন আসার সময় খুদিদার কাছ থেকে চেয়ে এনেছিল সে? ফেরত দেওয়ার জন্য? এই কারণে নয় দ্বিতীয়বার যাওয়া যেত, কিন্তু তারপরেও সে গেল কেন সে বাড়িতে? আলাপ হবে বলে? সে মেয়ের নাম যে শোভা তা প্রথম দিনই জেনে গেছে গগনেন্দ্র। টাউন হলেও মেয়েরা এখানে পরপুরুষের সামনে প্রায় আসে না বললেই চলে। শোভার মতো মেয়েরা তো নয়ই। অথচ দ্বিতীয় দিনে মেয়েকে পাশে বসিয়ে পনেরো মিনিট কথা বললেন খুদিদা। এই প্রথম কোনও নবীন নারীর মুখোমুখি বসেছিল গগনেন্দ্র। শোভা দু'টিমাত্র কথা বলেছিল। নিজের নাম আর 'আবার আসবেন।' দ্বিতীয় বাক্যটিই যত নষ্টের গোড়া। ওই বাক্যটির জন্যই তো আবার গিয়েছে সে। উপেনকে কেন্দ্র করে যে পালা সে বাঁধতে শুরু করেছিল, সেখানে এত তাড়াতাড়ি নায়িকার আগমন ছিল অপ্রত্যাশিত। এই অবস্থায় সুবোধ শর্মার পরামর্শ ছাড়া তার মাথা কাজ করছিল না।

সুবোধ শর্মা অবশ্য নায়িকার ব্যাপারে অজ্ঞই ছিলেন। তিনি চাইলেন গগনেন্দ্র যেন উপেনকে বুঝিয়েসুজিয়ে জলপাইগুড়ি ফেরত নিয়ে আসে। 'চা-বাগানের লেবারদের দিয়ে সাহেব পেটানোর মতলবটা একেবারে ছেলেমানুষি বিষয়, বুঝলে?' তিনি বললেন, 'কলকাতা থেকে কি সাপোর্ট পাবে ও এত দূরে? এইদিকে সাহেবদের সাপোর্টে লোকের কি অভাব আছে?' তিনি ব্যাখ্যা করে বোঝাতে থাকেন, 'টাউনে দেখলে তো? সতীশ ডাক্তার রায়সাহেব হচ্ছেন। এবার খগেনবাবুর মতো স্বদেশির সঙ্গে ওঁর মিলবে কেন? আর আবদুস সাত্তার তো সাহেবদেরই নমিনেশন। তারপর ধরো গোলাম কিবরিয়া, বিপুল ব্যানার্জি, মকলেচ্ছব রহমান, দিগেন ব্যানার্জি... এঁরাও তো সাহেবদের দিকটা কিছুটা ঢলে আছেন। উপেন যদি টাউনে এসে স্বদেশিদের সঙ্গে কাজ করে তাহলে সব দিক থেকেই মঙ্গল, কী বলো? আর তারিণীও বা নিজেকে ছেড়ে উপেনকে কতদিন মদত দেবে? জানোই তো পুলিশ কীভাবে ওর পিছনে লেগেছে!'

একটানা কথা বলে সুবোধ শর্মা থামলেন। গগনেন্দ্রর মনে হল, তিনি উপেনের শক্তি আর ক্ষমতা ঠিকমতো বুঝতে পারছেন না। এটাই সত্যি ছিল তাঁর কাছে। কারণ উপেনকে প্রায় নায়কের আসনে বসিয়ে রাখা গগনেন্দ্রর পক্ষে সুবোধ শর্মার মতো নিরপেক্ষ হওয়া ছিল সেই মুহূর্তে অসম্ভব। উপেনের নায়কত্ব কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছিল তার কাছে শোভার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর। এখনও অবধি মোট সাতটা বাক্য তাঁর মুখে উচ্চারিত হতে শুনেছে গগনেন্দ্র। এর মধ্যে 'আবার আসবেন' বাক্যটা কমন। বাকি ছ'টার মধ্যে তিনটেই উপেন সম্পর্কিত। তুতো দাদাটির প্রতি শোভার ধারণা অতি উচ্চ, তা এই তিনটি বাক্যেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল গগনেন্দ্রর কাছে। এর পরে উপেনের নায়কত্ব সম্পর্কে তার ধারণা উচ্চ থেকে উচ্চতর হতে থাকবে— এটাই তো স্বাভাবিক।

তাই সে দৃঢ়তার সঙ্গে জানাল, 'উপেন ঠিক পারবে দেখবেন। শোভাও ঠিক একই কথা বলেছে।'

অভিজ্ঞ সুবোধ শর্মা মৃদু হাসলেন। শোভা নামটির উল্লেখ অস্বাভাবিক মনে হলেও তিনি বিস্ময়ের ভাবটি গোপন করে রহস্য সন্ধানের চেষ্টায় অগ্রসর হয়ে পলকের মধ্যে মিলিয়ে ফেলবেন একটি সমীকরণ। কিন্তু কিছুই বুঝতে দিলেন না। কেবল গগনেন্দ্রর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা তো মিত্র, তা-ই না? কুলীন কায়স্থ।'

গগনেন্দ্র কিছু বলতে চাইল। কিন্তু সেও যেন ধরতে পারল সুবোধ শর্মার জিজ্ঞাসার গূঢ় উদ্দেশ্য। সহসা লাল হয়ে উঠল তার গণ্ডদেশ। সেই রক্তাভা লক্ষ করে পরম নিশ্চিত হয়ে সুবোধ শর্মা আরামকেদারা ত্যাগ করে বললেন, 'চলো, হাত-মুখ ধুয়ে নাও। মুড়কিটা আলাদা একটু মুখে দিয়ে দেখবে— এক্কেবারে গলে যাবে। এসো হিদারু।'

গগনেন্দ্র মিত্র নামক ব্যক্তিটির বদলে হিদারু এবার সত্যিই দই-মন্ডা মিশ্রিত মুড়কির কথা ভাবছে। টানা উত্তেজনা আর কৌতূহলের কারণে বেশ খিদে পেয়েছিল তার। ভিতরে তাদের দু'জনের জন্য তখন প্রায় পাঁচজনের উপযুক্ত খাদ্য পরিবেশিত হওয়ার অপেক্ষায়।

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

স্কেচ: সুবল সরকার

প্রস্তুতি পর্ব

নীলাদ্রি বাগচী

১

তার আর আত্মহত্যার মধ্যে সাদা সুতোর মতো ঝুলে আছে এই অদৃশ্য রেখা। ব্যর্থ লোক আত্মহত্যা কম করে। সফল, সচ্ছল লোক সামান্য ধাক্কাতেই গুঁড়ো হয়ে যায়, আত্মহত্যা করে। রতনদা সে দিন বলছিল। তার মতো লোকের ব্যাপারে বলেনি কিছু। জীবনকে চার আনা-আট আনায় ভাগ করলে যার ভাগে দুটোই আসে বেশি-কম মিলিয়ে। তারা? সে জানে না। শুধু তার আর আত্মহত্যার মধ্যে সাদা সুতোর মতো গেয়ে যাচ্ছেন বড়ে গোলাম, 'তনিক মো সে রইও না জায়ে'। কিন্তু আরও খানিক অপেক্ষা দরকার। যেমন এ মুহূর্তে মনে হল তোশকের নীচে, বুক র‍্যাকের কোনায় জমে আছে বেশ কিছু মেন'স ম্যাগাজিন। তার আত্মহত্যার পর সেগুলো পুলিশের হাতে চলে যাবে। চারপাশে কানাঘুষো হবে তার চরিত্র নিয়ে। কবে হয়ত শুভর বউয়ের সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছিল, সে সবাইকে বলে বেড়াবে, তখনই জানতাম, ওর হাবভাব একদম ভাল ছিল না। গল্প বাড়তে বাড়তে হয়ে যাবে, এইডস-ফেইডস ছিল, চরিত্র তো ভাল ছিল না একেবারে।

কীভাবে তাড়ানো যায় পত্রিকাগুলো? কাগজওয়ালাকে বেচে লাভ নেই। ও খবর কাউকে না কাউকে দেবেই। পাড়ারই কাউকে। ঠিক যেভাবে অসীমদার বাড়ি থেকে বিক্রি হওয়া বিয়ারের বোতলের খবর শিশি-বোতলওয়ালা এ বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল। কী সহজে অসীমদা, কারও সাতে-পাঁচে না-থাকা লোকটা দু'দিনে গোটা পাড়ায় 'মাতাল' খ্যাতি পেয়ে গেল। এখন বেচারার স্কুটারের হ্যান্ডেল কাঁপলেও সবাই সন্দেহ করে, টেনে আছে।

কাল ভোরের দিকে হাঁটতে বেরিয়ে ফেলে দেওয়া যায় পুকুরের আশপাশে, একটা ঝোপঝাড় থাকলেই যথেষ্ট। আছেও তো কয়েকটা। রেহাই। কিন্তু না। সকালের দিকে সাঁতার শিখতে আসা বাচ্চাগুলো খুঁজে পেয়ে যাবে ওইসব। গোটা পাঁচেক বাচ্চার চোখ বিস্ময় থেকে লোভে বদলে যাচ্ছে— কেটি বা কিমকে দেখে, এই ভাবনা তাকে অস্থির করে তোলে। তার নিজের চরিত্র নিষ্কলুষ— এই প্রমাণ করতে গিয়ে কিছু বাচ্চাকে বরবাদ করে দেবে সে?

ঘরের আবছা আলোয় এই দ্বিমাত্রিক যৌনতা কেমন আশ্চর্য লাগে। ছোঁয়া সম্ভব নয়, অথচ সমস্ত রহস্যভাণ্ডার ওই তার সামনে দিয়ে উলটে যাচ্ছে একের পর এক। অসহ্য, কিন্তু বাস্তব। বিচ্ছিরি আকর্ষণ। কিছু একটা করতে হবে। কালি লেপে দিলে কেমন হয়? সেই যেমন দক্ষিণ ভারতীয় কি হলিউড সফ্‌ট সিনেমার পোস্টারে থাকে। শুধু মুখ আর হাঁটু থেকে পা। মাঝখানে বিলকুল কালো, ঘোর অন্ধকার।

২

ঘুমের ভিতর দিয়ে সন্ধে এলে মাথা বিলকুল খালি হয়ে যায়, আর ভারীও। অন্ধকার ঘর আর বাইরের অন্ধকার ঠিক যেন এক নয়। এক পোঁচ রঙের ফারাক থেকে যায়। এই পোঁচটাই মাথা খালি করে দেয়, মাথা ভারী করে দেয়। একরাশ ছাত্রছাত্রী যেন কানের কাছে অবিরাম চেঁচিয়ে চলেছে, এরকম মনে হয় তখন।

প্রবীর পাগল হয়ে গেছে। ভরসন্ধেয় কে যেন চেঁচাতে চেঁচাতে গেল রাস্তা দিয়ে। কে প্রবীর? খামকা দিনের এত সময় থাকতে এই সন্ধেবেলায় যখন এক-আধটা হঠাৎ-শাঁখ আর ঘরে ঘরে টিভি বাজছে, তখন সে পাগল হতে গেল কেন? এর পরই তো শুরু হবে সিরিয়াল, প্রতিযোগিতার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠবে সমস্ত চ্যানেল। একে একে খসে পড়বে পা পেট বুক হাত গলা, শেষ অবধি মাথাও। তখন কে আর সুস্থ? কিন্তু তার আগে কেন? এই রহস্যময় প্রবীরের জন্য মনটা খারাপ হয়ে যায়।

পাশের বাড়ির বাচ্চাটিকে 'মুন্নি বদনাম হুই' পেয়েছে। সে গাইছে সারাক্ষণ। সুযোগমতো ওর বাবা-মাও। ওদের বাড়ির কুকুরটাও হয়ত কাতরানি ছেড়ে 'মুন্নি বদনাম হুই' শুরু করবে যে কোনও দিন।

বাড়ির পাশেই এত দুর্নাম, দুর্নাম কেন, বদনাম তো কেচ্ছাই। তো বাড়ির পাশেই এত কেচ্ছা, তবু তার বাঁচার ইচ্ছেটাই চলে গেছে। তার আর আত্মহত্যার মধ্যে সাবেগ মাঞ্জা সুতোর মতো ঝুলে আছে এইসব সফ্‌ট হার্ড পর্নোগ্রাফির পত্রিকা। এখন হাওয়ায় উলটে যাচ্ছে উদোম নারী একের পর এক। মাঝে মাঝে কালো অক্ষরে ছাপা ডাক্তার কি হাতুড়ের অভিমত। ট্রু স্টোরি। আবার উদোম নারী। ঘরের আবছা আলোয় এই দ্বিমাত্রিক যৌনতা কেমন আশ্চর্য লাগে। ছোঁয়া সম্ভব নয়, অথচ সমস্ত রহস্যভাণ্ডার ওই তার সামনে দিয়ে উলটে যাচ্ছে একের পর এক। অসহ্য, কিন্তু বাস্তব। বিচ্ছিরি আকর্ষণ। কিছু একটা করতে হবে। কালি লেপে দিলে কেমন হয়? সেই যেমন দক্ষিণ ভারতীয় কি হলিউড সফ্‌ট সিনেমার পোস্টারে থাকে। শুধু মুখ আর হাঁটু থেকে পা। মাঝখানে বিলকুল কালো, ঘোর অন্ধকার। অনেক সিনেমা হল অবশ্য কালি দেয় না, সগৌরবে চলিতেছে কিংবা হলের নাম লেখা একটা ফালি কাগজ মেরে দেয়। সেদিকে লাভ নেই। বাচ্চারা ছিঁড়ে দেখবে কী আছে নীচে। আড়াল সরানোর নামই তো জীবন। কখনও কখনও, যেমন এখন, আড়াল করাও।

৩

গৌর গান ধরেছে গলা খুলে। বিচিত্র মানুষ। কিছু করে না-র চেয়েও অদ্ভুত হল, ও কিছু করতেও চায় না। সারাদিন নেশার পয়সাটুকু জোগাড় করতে পারলেই হল। দুপুরে কালীবাড়ি, রাতে শম্ভুদার দোকানে ওর আড্ডা। দু'-চারজন দেয়ও টাকা। শম্ভুদা রাতে খেতেও দেয়। দিনে তো লঙ্গরখানা আছেই। এখন গাঁজা টেনে গলা ছেড়েছে। গাঁজায় স্বর খেয়েছে, সুর নয়। ভালই লাগে শুনতে। আজ অবশ্য মন দিয়ে শোনা যাচ্ছে না। মার্কার পেন দিয়ে কালি মাখানো বেশ কষ্টের কাজ। বাতাসে পাতা ফরফর করছে। জায়গামতো কলমের নিব বসছে না। ছোটবেলায় ছবিতে গোঁফ আঁকতে যে কনসেনট্রেশন দিত, সেরকম কনসেনট্রেশন দিতে হবে।

কিন্তু হচ্ছে না। যতই দ্বিমাত্রিক হোক, যত বিচ্ছিরি হোক, চোখ টানছেই। কদর্যতাই কি চোখ টানে? কাদা কি ফুলের আগে চোখে পড়ে?

ওই দ্বিমাত্রিক যদি ত্রিমাত্রিক হয়ে যেত এখন? হঠাৎ উঠে আসত পাতা ছেড়ে। তাহলে? নিজের নির্লজ্জে লজ্জা পেত কি? নাকি এই ঝুল-কালি মাখা ঘর, তেলচিটে বিছানা, ফাটা বালিশ, দেয়ালের চলটা-ওঠা বিচিত্র ছবি দেখে ঘেন্নায় কুঁচকে ফেলত মুখ। গলার কাছে পাকিয়ে ওঠা বমি চেপে দৌড় দিত বাথরুমের দিকে। আর ফাটা প্যানের কদর্য বাথরুমে পৌঁছে হড়হড় করে বমি পাত করত? বমির টক গন্ধ যেন নাকে এসে লাগে।

ফুলই বা সুন্দর কেন হবে? এই যে মেয়েটি কাদা মেখে চোখে আকর্ষণ আর শরীরে বিকর্ষণ সাজিয়ে পাতা ছাপিয়ে উঠে আসছে, এখানে কি সাদা কুৎসিত? কাদাই তো প্রতিমা গড়ে। মৃন্ময়ী। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। সিগারেট খেতে হবে একটা।

সাদা ধোঁয়া মনে করিয়ে দিল, তার আর আত্মহত্যার মধ্যে মাকড়সার সুতোর মতো ঝুলে আছে নেশা। যখন সে থাকবে না, এই নেশা কোনখানে যাবে? প্রতিদিন এই যে ভাঙা হাতলের চেয়ারে বসে ভরা রাতের সুখটান, কোথায় যাবে সে? অন্য বাড়ি, অন্য পাড়া? নাকি এ ঘরেই থাকবে? টিনের চালার এই পলেস্তারা খসানো ঘরে। আধার না থাকলেও তো সে একইভাবে থেকে যেতে পারে। তার নেশার ভূত। সে নেই। কিন্তু ও থাকবে, অশরীরী। মানুষ খুঁজবে সে। পরে যদি অন্য কেউ এই ঘরে থাকে, তার উপর ভর করবে। তার এই সুখটান, ধোঁয়া নিয়ে খেলা, তখন এই মানুষটির হয়ে যাবে। হয়ত তার নেশাও তার নয়। অন্য কারও নেশার ভূত তার ঘাড়ে চেপেছে। যে দিন প্রথম কলেজে ফাঁকা ক্লাসরুমে সিগারেট টেনেছিল, সেই টান অন্য কারও ছিল। হয়ত ক্লাসরুমে মারা গিয়েছিল সে। আর তাদের কলেজ বিল্ডিং তো আসলে পুরনো নবাব বাড়ি। কোনও নবাব বা তার আত্মীয়র হয়ত ছিল এই নেশা। নিজের বলে সত্যিই তো কিছু নেই।

আছে। অন্যমনস্কতা আছে। একরাতে এতগুলো পাতা কালি করতে হবে, তা না করে বসে বসে আজগুবি ভাবছে। নেশা কার, তাতে কী যায় আসে? নেশা কোথায় যাবে, তাতেই বা কী? কোনও কিছুতেই কিছু যায়-আসে কি? ঘরে নেশা, বাইরে গৌরের গান— এসবে কী হবে? আসলে এরাই পিছুটান। ভাবনার আড়ালে পা বাড়াতে বাধা দিচ্ছে। ঝেড়ে ফেলতে হবে এখনই এসব।

৪

কাঁদে রাধিকারমণ। গৌর খুব গলা তুলেছে। রাধিকারমণ তো কৃষ্ণ। আগেকার দিনে লোকের নাম হত। রমণ? কিন্তু সংঅগম নয়। রমণ সংঅগমের থেকে শিষ্ট। যেমন সংগম চলতি শব্দের থেকে। ভাষা কী বিচিত্র জিনিস। ভাষা না থাকলে প্রকাশ থাকে না। বোঝানো যায় না কিছু। তাও নয়। এই যে ভাষাহীন দ্বিমাত্রিক শরীর উঠে আসছে ঢেউ ভেঙে, লোনা বাতাসে ওর ভিজে চুলের এক-আধ কুচি কাঁপছে যেন, পিছনে ঝাপসা সমুদ্রের নীল-সাদার মিলমিশে বাদামি চামড়ার এই আভাস যেন মেরিলিন মনরো, উঁহু উরসুলা এন্ড্রুজ, মনরো এভাবে জল ভেঙে ওঠেনি কখনও, এর কোনও ভাষা লাগে না। একে বলে শরীরের আবেদন। ভাষা ছাড়াই ভাষার উল্লাস। জন্তুর আনন্দ। কিন্তু কী কুৎসিত। এই কদর্য ঢেকে দিতে হবে কালি দিয়ে। শিশুর জন্য এ দৃশ্য নয়। শিশুর পৃথিবী নির্মল।

ওই দ্বিমাত্রিক যদি ত্রিমাত্রিক হয়ে যেত এখন? হঠাৎ উঠে আসত পাতা ছেড়ে। তাহলে? নিজের নির্লজ্জে লজ্জা পেত কি? নাকি এই ঝুল-কালি মাখা ঘর, তেলচিটে বিছানা, ফাটা বালিশ, দেয়ালের চলটা-ওঠা বিচিত্র ছবি দেখে ঘেন্নায় কুঁচকে ফেলত মুখ। গলার কাছে পাকিয়ে ওঠা বমি চেপে দৌড় দিত বাথরুমের দিকে। আর ফাটা প্যানের কদর্য বাথরুমে পৌঁছে হড়হড় করে বমি পাত করত? বমির টক গন্ধ যেন নাকে এসে লাগে। গা ঘুলিয়ে ওঠে। জানালা বন্ধ তাই ঘরের বাতাস বদ্ধ, চাপা। খুলে দেওয়া যায় জানালাটা। কিন্তু জানালা খুলে এসব কি সম্ভব? এই উপুড় হয়ে শুয়ে কালি মাখানো বা এর পর সে যেগুলো করবে? রাতবিরেতে কেউ জেগে নেই তা কি হয়? ওই তো গৌর এখনও গাইছে। পিসানদের বাড়ির চাপা কলের আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে। আর যথারীতি পিসানদের পশ্চিম বাড়ির থেকে উদয়ের দাদু গাল দিচ্ছে পিসানদের, এত রাতে চাপা কলের আওয়াজ হচ্ছে বলে। জীবন কি ঘুমায়? কখনও? গৌর থামবে তো তার পরপরই মসজিদের আজান শোনা যাবে, মাড়োয়ারি মন্দিরে ‘জয় জগদীশ হরে’ শুরু হয়ে যাবে। জানালা খুললেই তো জীবন। কী নাটকীয় কথা। বাইরে ঝামেলা লেগেছে। বোধহয় পিসান উদয়ের দাদুকে খিস্তি দিয়েছে পালটা। এখন উদয় আর উদয়ের মা মিলে দিচ্ছে ওদের।

I was covered in red bumps of all sizes until the fall. My own mother would not have recognized me. The swelling went away eventually, but no after weeks of torturous itching and scratching... এক গল্পের মাঝের লাইন, বাতাস পাতা উলটে এখানে পৌঁছেছে। এটা কোন গল্প? সেই ফাঁকা দ্বীপে পৌঁছানো ভাঙা জাহাজের গল্প না? রবিনসন ক্রুসো আর ক্যানিবাল হলোকাস্টের খিচুড়ি। অসহ্য চুলকানি— সব অর্থেই। গল্পকার কত কী পারে। কুঁচকির চুলকানি থেকে বিছানায় ছড়িয়ে পড়া শরীর। সব তার লেখার বিষয় হতে পারে। এ লোকটার অবশ্য গোটা গায়ে চুলকানি। তবে ওই একই। কিন্তু ভাবনার জটে কাজ এগচ্ছে না। এই যে স্তূপ পত্রিকা— এদের কালি মাখানো এখনও বাকি। এর পর একবার বেরতে হবে। ফেলে আসতে হবে এগুলো পুকুরের ধারে, ঝোপে। কোনও চিহ্ন থাকবে না তাহলে। তার জগতের, তার ভাবনা, লোভ ও পাঁকের। মানুষ কী ভাববে এর পর? তার ব্যর্থতা খুঁজবে? কষ্টগুলো বুঝতে চাইবে? মজা করবে? মৃত্যু নিয়ে কেউ কি সত্যি সত্যি ভাবে? ভাবতে চায়? বাঁচার তাৎক্ষণিকে এত বড় আওয়াজ সহ্য করা যায়? আশপাশে কেউ কি বুঝতে পারছে, তার মেয়াদ এই কালি মাখানো আর ফেলে আসা অবধি? কেউ কি ভাবে?

৫

আর তার আত্মহত্যার মধ্যে পড়ে আছে কয়েকটা নগ্না, বিবসনা। তার আর আত্মহত্যার মধ্যে দরজায়, জানালায় ধাক্কা দিচ্ছে বেয়াড়া বাতাস। ঝড় উঠছে বাইরে। পরিসমাপ্তির আগে তীব্র বেজে উঠছে যেন বেহালা। বিছানায় ওই সে বসে আছে, স্থির, এক মনে সে দেখছে, বিবসনা। সে বুঝছে আকর্ষণ, সে বুঝছে দ্বিমাত্রিক। বিছানার চাদরে খানিক কালি চুপসিয়ে খোলা মার্কার পেনে শুকিয়ে যাচ্ছে কালি। ঝুল-কালি মাখা দেয়ালে আছড়ে পড়ছে পাখার বাতাস। ক্যালেন্ডারের ঘষটানির শব্দ আর বাথরুমে চুঁইয়ে পড়া জলের আওয়াজ— এই হচ্ছে উপস্থিত শ্রুতি। মন দিলে বোঝা যায় একটু ক্ষীণ বু বু ধ্বনিও যেন বা শোনা যাচ্ছে। অস্ফুট। অব্যক্তে সে যেন ব্যক্ত করছে নিজেকে। তার মতো করে ভাবলে কান্নার কোনও ভাষা হয় না। অথচ উপস্থিতে এই একমাত্র ভাষা যা তার প্রকাশ। তার আর আত্মহত্যার মধ্যে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে এই শব্দ। এখনও এই স্থির আর-একটা দিন। কেবল একটা দিন তার আর আত্মহত্যার মধ্যে। এই স্থির সিদ্ধান্তের কাছে তাকে অসহায় ভেঙে পড়তে দেখছে একমাত্র একটি টিকটিকি। দেয়ালবাতির নিচে থেকে সে দেখছে একটি মানুষকে। যে মানুষ স্থির, যে মানুষ বু বু, যে মানুষ মানবিক জড়তায় আচ্ছন্ন। কাল যে মানুষের অন্তিম, তার প্রস্তুতিপর্বের একমাত্র হতবাক সাক্ষী একমাত্র একটি শ্যামা পোকা দেখতে পেয়ে সেইদিকে অগ্রসর হল।

ধর্ষণ আর খুনের মামলায় নাম জড়িয়ে থাকা নবেন্দু মল্লিক ব্লকের যুব প্রেসিডেন্ট। সাদা পাজামা আর পাঞ্জাবি ছাড়া কিছু পরেন না। বড় মাপের নেতাদের সঙ্গেও তাঁর বেজায় দহরমমহরম। এদিকে রাম মিশ্র গ্রিন রিসর্টে পৌঁছচ্ছেন ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। রাম মিশ্র মদ্যপান করেন না। এক মেয়ে নিয়েও দু'বার আসেন না। রিসর্ট ম্যানেজার এখন অপেক্ষা করছেন এবার কোন মেয়ে নিয়ে তিনি আসছেন, তাকে দেখার জন্য। যে এল সে পরদিন সকালেই আবার রাম মিশ্রর গাড়ি চালিয়ে ঘুরতে বেরিয়ে গেল। অন্যদিক দিয়ে যে আগন্তুক ডুয়ার্সে ঢুকল তার মারফতই পাচার হয়ে যাবে চার পিস ডুয়ার্স তরুণী। এভাবেই ফুটে উঠছে অন্ধকার ডুয়ার্সের ছবি।

অরণ্য মিত্র

৭

নবেন্দু মল্লিক এটা ভেবে নিশ্চিত ছিলেন যে, তাঁদের গ্রামের শ্যামল আসলে একটা নেপালি মেয়ের সঙ্গে ভেগেছে। এই খবরটা তাঁকে দিয়েছিল কন্যাসাথি এনজিও-র লাবনি দাস। কাশিয়াগুড়ির বাজার ছাড়িয়ে প্রায় আধ কিলোমিটার দূরে খানিকটা জমি ছিল নবেন্দু মল্লিকের বাবার। সে জমিতে এলাকার পক্ষে তাক লাগানো একটা দোতলা বাড়ি তুলেছিলেন নবেন্দু। প্রথমে ভেবেছিলেন ব্যাঙ্ক ভাড়া দেবেন। কিন্তু কলকাতার একজন নামী নেতা তাঁকে ফোন করে ধূপগুড়ির আশপাশে একটি বাড়ি দেখতে বলে। কন্যাসাথির অফিস হবে। এনজিও-টা মেয়েদের নিয়ে কাজ করে। ডুয়ার্সে শিডিউলড ট্রাইব মেয়েদের নিয়ে একটা ডেটাবেস তৈরি করার জন্য অফিস। কর্মীরা সব মেয়ে, তাই একটু সিকিয়োর্ড জায়গা চাইছিলেন সেই নেতা। নবেন্দু মল্লিক তখন দোতলা বাড়িটা অফার করে।

বাড়ি দেখে লাবনি দাস খুব খুশি হয়েছিলেন। নবেন্দু মল্লিক থাকতে কাশিয়াবাড়ি কেন, আশপাশের গ্রামের কেউই যে কন্যাসাথির মেয়েদের দিকে নজর দেবে না— এটা লাবনি দাস বুঝেছিলেন। বছরখানেক হল তারা কাশিয়াগুড়িতে অফিস করে কাজ করছে। কর্মীরা একজন বাদে সবাই বাইরের। তিনজনের বাড়ি ২৪ পরগনা আর একজন থাকে আদ্রায়। কাশিয়াগুড়ি নিয়েই কন্যাসাথির নর্থ বেঙ্গল প্রবেশ। পরের অফিসগুলিতে লোকাল মেয়ে নেওয়া হবে। নবেন্দু মল্লিক আগেই তিনজনের নাম দিয়ে রেখেছে লোকাল মেয়ের চাকরির জন্য।

গ্রামের যে মেয়েটা আসলে ফাইফরমাশ খাটার কাজ করে, তার নাম শুক্লা। নবেন্দু মল্লিক কাশিয়াগুড়িতে এনফিল্ড চালিয়ে এলে একবার কন্যাসাথির অফিসে ঢুঁ দিয়ে যান। বেশির ভাগ দিনই শুক্লা ছাড়া বাকি সবাই ডাঁটা তুলতে বাইরে থাকে। নবেন্দু মল্লিক শুক্লার সঙ্গে একটু ছোঁয়াছুঁয়ি করে, এক কাপ চা খেয়ে আধ ঘণ্টা কাটিয়ে যান। শুক্লার চেহারাটা বেশ ভারী ভারী। দক্ষিণ ভারতীয় পর্ন ভিডিয়োতে বউদিগুলো যেমন দেখতে। নবেন্দু মল্লিকের খাসা লাগে এমন ফিগার।

শ্যামল নিখোঁজ হওয়ার সপ্তাহখানেক আগে নবেন্দু মল্লিক গ্রামের বাড়িতে ছিলেন। পরদিন দুপুরে ফালাকাটা রওনা দেওয়ার আগে কন্যাসাথির অফিসে গিয়ে দেখেন লাবনি দাস রয়েছেন। তিনি এ কথা-সে কথার পর জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'শ্যামল দাসকে চেনেন? কাশিয়াবাড়িতেই থাকে।'

'উমাদির ছেলে তো? ভালই চিনি। উমাদি তো আমাদেরই ভোট দেয়।' বলেছিল নবেন্দু মল্লিক, 'কিছু হয়েছে নাকি?'

'একটা মেয়ের কাজের জন্য দু'-তিনবার এসেছিল। নেপালি মেয়ে। মনে হয় রিলেশন আছে।'

'কী করে বুঝলেন?' গ্রামের ছেলের প্রেমের কথায় নবেন্দু মল্লিক উৎসাহ পেলেন। লাবনি দাস সেটা টের পেয়ে মুচকি হেসে বলেছিল, 'আরে দাদা! আমি তো প্রায়ই শিলিগুড়ি যাই এনজিও-র কাজে। হাওড়া পাম্পের সামনে বাস স্ট্যান্ডে তিন-চার দিন দেখেছি। মেয়েটা নেপালি হলেও সুইট আছে।'

লাবনি দাসের বাইরে যাওয়ার তাড়া ছিল। এনজিও-র কাজের জন্য একটা গাড়ি আছে। টাটা কোম্পানির চারশো সাত মার্কা ছোট বাসগুলোকে মডিফাই করে বানানো হয়েছে গাড়িটা। যদি কোনও মেয়েকে রেসকিউ করতে হয়, তাই এমন চারদিক ঢাকা দেওয়া গাড়ি বানিয়ে রেখেছে কন্যাসাথির ম্যানেজমেন্ট।

ডুয়ার্সের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাসের যোগাযোগ ভাল না। সেদিকে কাজে গেলে গাড়িটা যায়। একজন ড্রাইভার আছে। বিহারি। নাম ভোলা সিং। যাওয়ার থাকলে সে সকাল সকাল চলে আসে জলপাইগুড়ি থেকে। আজকেও এসেছিল। লাবনি দাস তাঁর সঙ্গে বাকি তিনটে মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন কালচিনির দিকে। যাওয়ার সময় বললেন, 'আপনাকে তো আজ চা খাওয়াতে পারলাম না দাদা! শুক্লা আছে। একটু বসে যান। চা বানিয়ে দেবে।'

প্রস্তাবটা অনিচ্ছা নিয়ে খারিজ করেছিল নবেন্দু মল্লিক। এনফিল্ড চালিয়ে তখনই রওনা দিয়েছিল ফালাকাটার দিকে। গাড়িতে ওঠার আগে লাবনি দাস বলেছিলেন, 'শ্যামল ছেলেটাকে আবার কিছু বলতে যেয়েন না দাদা! এ বয়সে ওসব হয়।'

নবেন্দু মল্লিক অবশ্য এত ফালতু ব্যাপারে শ্যামলের সঙ্গে কথা বলতেন না। কিন্তু এখন তাঁর মনে হচ্ছে, কিছু খোঁজখবর রাখলেই পারতেন। ছেলেটো সাত দিন হল নিখোঁজ। আজ থানায় ডায়েরি দেওয়া হয়েছে। নেপালি মেয়েটার খবর কিছু থাকলে সুবিধা হত। স্থানীয় দৈনিকে ছোট করে খবরটা বেরিয়েছে গতকাল। সেখানে অবশ্য বিয়ে করে লুকিয়ে থাকার ব্যাপারটা উল্লেখ করা হয়েছে। থানাকে বলে দিতে হবে সাংবাদিকদের ফট করে কিছু না বলার জন্য। অবশ্য এটাও খুব সত্যি যে, নেপালি মেয়েকে বিয়ে করে এতদিন লুকিয়ে থাকার কোনও মানে হয় না। নবেন্দু মল্লিকের এখন মনে হচ্ছে যে, কিছু গড়বড় আছে।

কাগজে বন্ধুত্ব করার বিজ্ঞাপন দেখে ছেলেপুলে যে অনেক টাকা জলে দিয়ে এসেছে, সে খবর নবেন্দু মল্লিকের অজানা নয়। কিন্তু তারা সব বড়লোক বাপের ছেলে। শ্যামলের পক্ষে সেইসব ট্র্যাপে পা দেওয়া সম্ভব নয়। কোনও মেয়ে তাকে ফাঁসাতে চাইবে— এটাও বিশ্বাস করা কঠিন। তাহলে ছেলেটা গেল কোথায়?

ভাবতে ভাবতে নবেন্দু মল্লিক কোনও দিশা না পেয়ে থানার বড়বাবুকে ফোন করলেন। ওপাশ থেকে বড়বাবু নরম গলায় বললেন, 'হ্যাঁ স্যার। বলেন।'

'শ্যামলের কেসটা আজ ডায়েরি হয়েছে না?'

'হ্যাঁ স্যার। আমরা তদন্ত শুরু করেছি। ফোনের ডিটেল হাতে এলে অনেকটা পরিষ্কার হবে বলে মনে হচ্ছে।'

'নেপালি মেয়ের একটা ব্যাপার আছে শুনছি।'

'ছেলেটার মা বলছে, সে নাকি গত এক বছরে খুব বেশি হলে ধূপগুড়ি পর্যন্ত গিয়েছে। শিলিগুড়ির কোনও প্রশ্নই নেই।'

'মায়েরা অমন বলে। মাকে না জানিয়ে ধূপগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি গিয়ে ফিরে আসা কী এমন টাফ কাজ? আপনি নেপালি মেয়ের কেসটা অতটা ইগনোর করবেন না।'

'আমরা সব দিক খতিয়ে দেখব।'

'দেখুন। আর মিডিয়াকে দূরে রাখবেন। সামনে সমবায়ে ভোট আছে। কোনও ইনফর্মেশন এলে জানাবেন। রাখছি।'

নবেন্দু মল্লিক মোবাইল পকেটে পুরলেন। ওপাশে বড়বাবু ফোনের লাইন কেটে টেবিলে নামিয়ে রাখতে রাখতে মনে মনে বললেন, 'শালা পুলিশকে ইনভেস্টিগেশন শেখাচ্ছে। তালমতো যে দিন পাব, পেছনে গুঁজে দেব!'

৮

জয়গাঁওয়ের একটা সাধারণ হোটেলে বসে বিজু প্রসাদ বিকেল থেকে হুইস্কি খাচ্ছিলেন। এখন সন্ধে সাতটা বাজে। বেজায় শীত। বিজু প্রসাদ হুইস্কি খাচ্ছিলেন বলে অতটা টের পাচ্ছিলেন না। গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে খাটে আধশোয়া হয়ে টিভিতে সানি লিওনের নাচ দেখছিলেন ঠিকই, কিন্তু মনটা ঠিক সেখানে ছিল না। কাল দুপুর নাগাদ একটা ফোন এসেছিল। বিজু প্রসাদ তখন বেশ হালকা মনে জয়গাঁওতে ঢুকছেন। খানিক আগেই চঞ্চল থাপার ফোন এসেছিল। মোবাইল ব্যবহারের ব্যাপারে বিজু প্রসাদ খুব সাবধান থাকে। এই চুতিয়া যন্ত্রটা ব্যবহার করা মানেই পুলিশের তল্লাশিতে ধরা পড়ে যাওয়া। খুব দরকার না হলে ফোন করার হুকুম নেই তাঁদের। ফোন করলেও দু'-একটা কথা 'কোড' দিয়ে বলতে হবে। কাল চঞ্চল থাপা শুধু বলেছিল, 'কুরিয়ার ভেজ দিয়া সাব। চার পাকিট।'

মানে চারটে মেয়েকে দিল্লির ট্রেনে তুলে দিয়েছে। কোনও সমস্যা হয়নি। অবশ্য সমস্যা হবেই বা কেন? মেয়েগুলোকে ইঞ্জেকশন দিয়ে দেওয়া আছে। ঢুলতে ঢুলতে দিল্লি চলে যাবে। মাথা কাজ করবে না। সঙ্গে আরও দু'জন মহিলা থাকবে। তাকে সাহায্য করার জন্য মোহনলাল থাকবে ট্রেনে। এভাবেই তো কুরিয়ারে প্যাকেটগুলো যাচ্ছে বছরের পর বছর।

চঞ্চল থাপার ফোনের বক্তব্য শুনে বিজু প্রসাদ হালকা গলায় বলেছিলেন, 'রং নাম্বার।'

চঞ্চল থাপা জিজ্ঞেস করেছিল, 'ক্যা আপকা নাম সুন্দরলাল নহি?'

'সরি ভাই। ইয়ে বিজু পরসাদকা সিম কার্ড হ্যায়।'

চঞ্চল থাপা ফোন কেটে দেয়। বিজু প্রসাদ জয়গাঁও এলে যে হোটেলটায় ওঠেন, তার গেটের কাছে আসতেই আরেকটা ফোন এসেছিল অচেনা নম্বর থেকে। বিজু প্রসাদ 'হ্যালো' বলতেই একটা খসখসে গলায় কেউ বলল, 'আপকো গাড্ডি আ গই দিল্লিসে।'

বিজু প্রসাদ সঙ্গে সঙ্গে বুঝেছেন আসল অর্থটা। দিল্লি থেকে লোক আসছে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। মনের হালকা ভাবটা ত্যাগ করে তিনি চাপা গলায় বলেছেন, 'গাড়ি? কৌনসা?'

'আপ গাড্ডি বুক নহি কিয়া?'

'জি ম্যায় তো বিজু পরসাদ। জয়গাঁও সে।'

'সরি।'

ওপাশ থেকে ফোন কেটে দেয়। বিজু প্রসাদ জানিয়ে দিলেন কোথায় আছেন। এটাই নিয়ম। দিল্লি থেকে যে আসবে, তাকে বিজু প্রসাদ চেনে। বোসবাবু। একবারই দেখা করেছিলেন রায়গঞ্জে। বিজু প্রসাদ যাদের হয়ে কাজ করেন, তাদের মধ্যে এই একজনকেই চেনেন। বোসবাবুই পুরো ওয়েস্ট বেঙ্গল আর নর্থ-ইস্ট সামলান। হাতের তালুর মতো চেনেন জায়গাগুলো। বাঙালি হলেও উত্তর ভারতীয়দের মতো চোস্ত হিন্দি বলেন। বিজু প্রসাদের সঙ্গে অবশ্য রায়গঞ্জে বাংলাতেই কথা হয়েছিল। বিজু প্রসাদও বাংলা খারাপ বলেন না।

কিন্তু বোসবাবু কেন আসবেন? এমনিতে দু'মাসে তাঁর লোক একবার করে বিজু প্রসাদের সঙ্গে দেখা করে টাকা দিয়ে যায়। 'রোমিয়ো'দের নাম দিয়ে যায়। এদিক থেকে যে মেয়েদের পাচার করা হয়, তাদের প্রেমের ফাঁদে ফেলার জন্য যারা কাজ করে, তাদের বলা হয় রোমিয়ো। দরকারে এরাই আবার কাজের টোপ দেয়। তবে একবার যে রোমিয়ো ডুয়ার্স থেকে মেয়ে তুলে নিতে পারে, দ্বিতীয়বার তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় সাউথ বেঙ্গলে। তারপর অন্য স্টেটে। বিজু প্রসাদ নিজেও প্রথম কাজে নেমেছিলেন রোমিয়ো হয়ে। ঝাড়খণ্ডে। যে বিহারি মেয়েটাকে দিল্লিতে পাঠিয়েছিলেন, সেটা নাকি পরে এক কাস্টমারকে খুন করেছিল।

গতকাল ফোনের পর বোসবাবুর উচিত আজকে আসা। বিজু প্রসাদ তাই আজ হোটেল থেকে বার হননি। ডুয়ার্সের এমন অনেক জায়গায় তিনি ঘুরে বেড়ান। ছোট হোটেলে ওঠেন। শিলিগুড়ি থেকে কুমারগ্রাম তাঁর এলাকা। বছর তিনেক আগে ভূমিকম্পে নেপালের বহু এলাকা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিল। প্রচুর লোক বাড়িঘর-কাজ হারিয়েছিল তখন। কাজের সন্ধানে নেপাল থেকে ভারতে মেয়েদের আসার ধুম লেগে

চারটে মেয়েকে দিল্লির ট্রেনে তুলে দিয়েছে। কোনও সমস্যা হয়নি। অবশ্য সমস্যা হবেই বা কেন? মেয়েগুলোকে ইঞ্জেকশন দিয়ে দেওয়া আছে। ঢুলতে ঢুলতে দিল্লি চলে যাবে। মাথা কাজ করবে না। সঙ্গে আরও দু'জন মহিলা থাকবে।

যায় এর পর। বিজু প্রসাদ তখন নেপালের দায়িত্বে। তাঁর কাজে খুশি হয়ে দিল্লির কর্তারা তাঁকে ডুয়ার্সে নিয়ে আসেন। ইদানীং নেপালের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক খুব একটা ভাল যাচ্ছে না। নেপালে কাজের হুজ্জোতি বাড়ছে। গুচ্ছের এনজিও নেমেছে মেয়ে আর বাচ্চাদের উদ্ধার করার জন্য। তুলনায় ডুয়ার্স অনেক সেফ। বিজু প্রসাদ কাজও করছে চুটিয়ে। মনে হয় বোসবাবু তাঁকে বাংলাদেশে কাজ করার জন্য বলতে আসবেন।

বাংলাদেশের কথা ভেবে বিজু প্রসাদ একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েন। গেলাসে বড় একটা চুমুক দেন। আলু আর ছোলা সেদ্ধ মুখে দিয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়েন। তখনই বেজে ওঠে তাঁর মোবাইল। ফোনটা ধরতেই হোটেলের ম্যানেজার কাম মালিক তাঁকে বললেন, 'একজন দেখা করতে এসেছে বিজুজি।'

'পাঠিয়ে দিন।'

মিনিটখানেক পরে দরজায় টোকা পড়তেই বিজু প্রসাদ বললেন, 'খুলা হ্যায়। আইয়ে।'

লোকটা ভিতরে ঢুকল। বিজু প্রসাদ অবাক হয়ে দেখলে সে বোসবাবু নয়। নীল সোয়েটার আর কালচে সবুজ প্যান্ট পরা মাঝারি চেহারার লোকটা মাথা থেকে টুপিটা খুলতেই অনেকটা টাক বেরিয়ে এল।

'বোসবাবু দুবাই গিয়েছেন। আমি চার্জে। আমাকে দাসবাবু বলতে পারেন।'

'বোসেন দাদা।' বিজু প্রসাদ অবাক ভাবটা কাটিয়ে বলে, 'হুইস্কি চলে তো?'

'আমি এখনই চলে যাব।' সামনে রাখা কাঠের চেয়ারে বসলেন দাসবাবু। তারপর ডিসেম্বরের শীতের চাইতেও শীতল গলায় বললেন, 'খুন করার দরকার হল কেন? মেয়েটা চেঁচিয়েছিল শুনলাম। লোটিয়া তো আরেকটু হলেই গোল হয়ে যেত!'

বিজু প্রসাদ চুপ করে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপরে বললেন, 'আপনি ইলজাম দিচ্ছেন। কেসটা খুব কুইক ডিসিশন নিয়ে ম্যানেজ করলাম কিন্তু।'

'লাশ?'

'মেয়েটা যেখানে ছিল, ওখানেই। মাটির নিচে আছে। সেফ।'

দাসবাবু কথাটা শুনে একটু হেসে বললেন, 'লাশের আবার সেফটি কী? বলো আমরা সেফ!'

বিজু প্রসাদ নিশ্চিন্ত বোধ করলেন এবার। এখনও পর্যন্ত যে তিনটে মার্ডারের সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে তাঁকে, তার কোনওটাতেই কোনও বিকল্প ছিল না। দিল্লি সেটা জানে।

৯

কনক দত্ত ঢুকতেই ধূপগুড়ি থানার ইনচার্জ গুপ্তবাবু উঠে দাঁড়িয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'ওয়েলকাম স্যার।'

'আমাকে স্যার বলা উচিত নয় গুপ্ত। আমি এখন রিটায়ার্ড।'

'আমি আপনার রেকর্ড জানি স্যার। গঙ্গারামপুরে আমার প্রথম পোস্টিং-এর সময় আপনার আন্ডারে তিন মাস ছিলাম, মনে আছে স্যার?'

'তা-ই?' কনক দত্ত বসতে বসতে বললেন, 'তবে সেই অনারে একটু কোঅপারেট করবেন নিশ্চয়ই?'

'কী ব্যাপারে বলুন তো?'

'শ্যামল দাসের ডায়েরিটা নিয়ে কিছু অগ্রগতি?'

গুপ্তবাবু গলা নামিয়ে বললেন, 'গোলমাল তো দেখাই যাচ্ছে। তবে চাপ আছে। একেবারে শিয়োর না হয়ে কিছু ডিসক্লোজ করব না। আপনাকে আনঅফিশিয়ালি বলতে পারি।'

'যা হবে সব আন অফিশিয়াল।' কনস দত্ত হাসলেন, 'আমি আপনাকে সেফ সাইডে রাখব।'

'শ্যামলের মোবাইল ওই দিন সন্ধে ছ'টার একটু আগে সুইচড অফ হয়। লাস্ট লোকেশন ছিল লাটাগুড়ি আর ক্রান্তির মাঝামাঝি একটা জায়গায়।'

'স্ট্রেঞ্জ!' কনক দত্ত বেশ অবাক হলেন, 'শ্যামল বলেছিল শিলিগুড়ি যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে ক্রান্তির রাস্তায় যাওয়ার কারণ কী? অবশ্য ক্রান্তি থেকে ওদলাবাড়ি হয়ে সেবক পেরিয়ে শিলিগুড়ি যাওয়া যায়। কিন্তু সে অনেক ঘুরপথ, আর এমন গোলমেলে রুটে কোনও বাসও চলে না।'

'সত্যিই স্ট্রেঞ্জ স্যার।' গুপ্তবাবু চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন, 'এটুকু ছাড়া অবশ্য কল লিস্ট চেক করে তেমন কিছু পাইনি। সুইচড অফ হওয়ার আগে লাস্ট কল দুটোর কাছাকাছি। আপনার মিসেসের নাম্বারে। সেটার লোকেশন ছিল ময়নাগুড়ির নতুন বাজার। এর বাইরে কয়েকজন বন্ধুর নাম্বার পাওয়া গিয়েছে। সবাই লোকাল। মিসিং হওয়ার দিন সকালে লাবনি দাস বলে কাশিয়াগুড়ির একটা এনজিও-র ইনচার্জকে ফোন করেছিল। সেটা অবশ্য খুব সকালে। ভোর পাঁচটা নাগাদ।'

'সেই লাবনি দাসকে জেরা করেছেন?'

'চাকরির ব্যাপার।'

'অত ভোরে?'

'লাবনি দাসের কথা অনুসারে তার নাকি ওই দিন সকাল দশটা নাগাদ এনজিও-র অফিসে আসার কথা ছিল। ফোন করে সেটা ক্যানসেল করে। আর জানায় যে, শিলিগুড়িতে একটা কাজের জন্য যাচ্ছে বলে আসতে পারবে না।'

'ওই এনজিও-তে একটা নেপালি মেয়ের কাজের ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছিল শুনেছি।'

'রাইট স্যার।' গুপ্তবাবু একটু ঝুঁকে মাথাটা এগিয়ে দিলেন, 'এই নেপালি মেয়ের ব্যাপারটা খুব পিকিউলিয়ার। নবেন্দু মল্লিকের নাম শুনেছেন তো? যুব নেতা। সে তো এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে বসে আছে। ওই লাবনি দাসও নাকি দেখেছে। যদি বিয়ে-ফিয়েরই কেস হয়, তবে এতদিন ফোন অফ করে লুকিয়ে আছে কেন?'

গুপ্তবাবু থামলেন। কনক দত্ত মৃদু হেসে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলেন চেম্বার থেকে। শিলিগুড়ির বদলে ক্রান্তির রাস্তায় শ্যামল কেন গিয়েছিল, সেটা একটা জবর প্রশ্ন। কনক দত্ত একটা জটিলতারও ইঙ্গিত পাচ্ছিলেন। কিন্তু জটিলতার মুখটা আন্দাজ করতে পারছিলেন না। শ্যামল ময়নাগুড়ি এবং সেখান থেকে শিলিগুড়ি যাওয়ার সিদ্ধান্ত কবে নিয়েছিল। উমাকে এই প্রশ্নটা তিনি করেননি। পুলিশ কি করেছিল?

কনক দত্ত দ্রুতপায়ে বাড়ি ফিরে এলেন। ছেলের খবর না পেলেও উমা কাজে আসা ছেড়ে দেয়নি। কিন্তু তার দিকে তাকালেই মায়ের

অন্তরের উদ্‌বেগটা অনুমান করতে পারেন তিনি। তখন মনে হয় যে, শ্যামলের নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটা কেবল নেপালি মেয়েকে বিয়ে করার কারণে হয়ে থাকলেই ভাল। কিন্তু পুলিশের মন অত সরল যুক্তি মানতে চায় না। তার বয়সি ছেলে বিয়ে করতে গেলে নিশ্চয়ই কোনও না কোনও বন্ধুকে নিয়ে যাবে। তেমন হলে বন্ধুরাই মুখ খুলত এদ্দিনে। শ্যামল সাবালক। মেয়েটা কি মাইনর?

কনক দত্ত তবুও নিশ্চিত হতে পারলেন না। নেপালি মেয়েকে বিয়ে করে শ্যামলের বেপাত্তা হয়ে যাওয়ার ঘটনাটা পুলিশের যুক্তিতে খাপে খাপে মিলছে না কিছুতেই। তিনি অন্যমনস্কের মতো বাড়িতে ঢুকলেন। উমা বারান্দায় বসে ছিল। কনক দত্ত তার সামনে দাঁড়ালেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'চাকরির ব্যাপারে ময়নাগুড়ি যাওয়ার কথাটা কবে প্রথম বলেছিল শ্যামল?'

উমা নতমুখে আস্তে আস্তে বলল, 'ওই দিন সকালে। তারপর একসঙ্গেই তো বের হইসিলাম। ধূপগুড়ি থেকে ও বাস ধরল।'

'কোন বাস?'

প্রশ্নটা করেই কনক দত্ত ভাবলেন, বাজে প্রশ্ন। বাসের নাম জেনেই বা কী হবে? কিন্তু উমা তেমন নিচু গলাতেই উত্তর দিল, 'মা ভবানী। কোচবিহার থেকে জলপাইগুড়ি হয়ে আসে। ওর কন্ডাক্টর শ্যামলের সঙ্গে ইশকুলে পড়ত, ওইই তো ডেকে নিল শ্যামলকে।'

কনক দত্তর মনে হল, মা ভবানী বাসের কন্ডাক্টরকে একবার ধরা দরকার।

(ক্রমশ)

ঝান্ডিতে মেঘ এসে কানে কানে কথা বলে

শিয়ালদা থেকে রাত সাড়ে আটটার কাঞ্চনকন্যায় চেপে এক ঘুমে রাত কাবার করতে না করতেই পৌঁছে যাবেন নিউ জলপাইগুড়ি। সেখান থেকে গরম চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ডুয়ার্সের অপরূপ শোভা দেখতে দেখতে সকাল ন'টা নাগাদ ট্রেন এসে থামবে পিকচার পোস্টকার্ডে আঁকা ছবির মতো সুন্দর নিউ মাল জংশনে। স্টেশনের বাইরেই সার দিয়ে দাঁড়ানো অসংখ্য ছোট গাড়ি। দরদাম সেরে একটা ছোট গাড়ি ভাড়া করে বেরিয়ে পড়তে হবে আমাদের আজকের গন্তব্যের উদ্দেশে। মালবাজার থেকে ডামডিম, গোরুবাথান হয়ে যে পথটি চেল নদী পেরিয়ে আপার ফাগু চা-বাগানের বুক চিরে এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে, সেই পথ ধরে বৌদ্ধ স্তূপের পাশ দিয়ে নিম বস্তি, সুনতালে হয়ে একের পর এক চড়াই ভাঙতে ভাঙতে ৩২ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিলেই আপনি পৌঁছে যাবেন ৬০০০ ফুট উচ্চতার এমন এক জনপদে, প্রকৃতি যেখানে ধ্যানগম্ভীর। পাখির কূজন ছাড়া যেখানে অন্য কোনও শব্দের প্রবেশাধিকার নেই। যেখানে ঘন বনানীর ফাঁক দিয়ে উড়ে আসা মেঘ অনিঃশেষ নিস্তব্ধতাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে কানে কানে কথা বলে। সেই আশ্চর্য নৈঃশব্দ্যের চারণভূমিই আমাদের আজকের গন্তব্য— ঝান্ডি। কালিম্পং মহকুমার গোরুবাথান ব্লকের অন্তর্গত এই পর্যটনকেন্দ্রের বিশেষত্ব হল এর অবস্থান। ঝান্ডি থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যেমন এক বিরল অভিজ্ঞতা, তেমনি এখান থেকে ডুয়ার্সের প্রধান প্রধান নদী, যেমন— তিস্তা, চেল, ঘিস, লিস, ডায়না ইত্যাদি দেখতে পাওয়াও কম আকর্ষণীয় নয়। এ ছাড়া ঝান্ডি থেকে সন্ধ্যাবেলায় দূরের আলো ঝলমল সিকিম যেমন দৃশ্যমান, তেমনি দৃশ্যমান সমতলের বেশ কয়েকটি স্থান, যার মধ্যে অন্যতম শিলিগুড়ি। সূর্যাস্তের পর একদিকে যখন ধীরে ধীরে অন্ধকার নামে, অন্য দিকে তখন একের পর এক আলোকমালায় সেজে ওঠে শিলিগুড়ি। ঝান্ডি থেকে সেই দৃশ্য দেখা এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা। এ ছাড়া এখানকার অন্যতম আকর্ষণ ট্রেকিং। মাত্র ঘণ্টা দুয়েক ট্রেক করলেই ঘুরে আসা যাবে নোয়াম রেঞ্জ বনাঞ্চলের ভিতরে এমন এক জায়গা, নদীর কুলকুল সংগীতে ঘুম ভাঙে বলে যে জায়গার নাম গীতখোলা। ঝান্ডি থেকে মাত্র ৪ কিলোমিটার দূরত্বে রয়েছে চাখুমডাঁরা। স্থানীয়দের বিশ্বাস, এখানেই জন্মেছিলেন শেষ লেপচা রাজা গেবা আচুক, যিনি ভারত ভূখণ্ডকে ভুটান রাজার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন। যুদ্ধ শেষে মৈত্রী চুক্তি করার জন্য ভুটানরাজ তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেন এবং সেই দুঃখে ও আত্মসম্মান বাঁচাতে খরস্রোতা চেল নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করেন লেপচা রাজার স্ত্রী অর্থাৎ রানি। তাই এখানে চেল নদী বা চেলখোলার নাম মুক্তিখোলা।

ঝান্ডি বা তার সন্নিহিত লুংসেল, মানজিন এলাকার আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এখানকার মাটির উর্বরতা। রাসায়নিক বা জৈব কোনওরকম সার প্রয়োগ না করেই স্থানীয় বাসিন্দারা এখানকার মাটিতে যে শাকসবজি ফলান তা যেমন সুস্বাদু, তেমনি শরীরের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী।

নির্বাক প্রকৃতি যেখানে বাঙ্ময় হয় বাতাসের শব্দে আর পাখির কূজনে, সেখানেও আজ আশঙ্কার মেঘ জমছে বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সম্ভবত সেই কারণেই ২০১২ সালের পর ঝান্ডিতে আর তুষারপাত হয়নি। যদিও ডিসেম্বরের শেষ থেকে জানুয়ারির শেষ পর্যন্ত রাতের তাপমাত্রা ১ ডিগ্রির আশপাশে ঘোরাফেরা করে।

ঝান্ডিতে রাত্রিবাসের জন্য রয়েছে বেশ কয়েকটি সুদৃশ্য কটেজ নিয়ে তৈরি ঝান্ডি ইকো হাট। এখানে থাকতে হলে আগে থেকেই বুকিং করে নেওয়া ভাল। (যোগাযোগ— রাজেন প্রধান- ৯৪৩৪১১৬৩২৫) এ ছাড়াও আছে দোরজে শেরপা, অমৃতা ছেত্রিদের হোমস্টে। যাতায়াতের জন্য মালবাজার, ডামডিম বা গোরুবাথান থেকে ছোট গাড়ি ভাড়া করতে হবে।

সুধাংশু বিশ্বাস

ছবি: উতংক দে

বেরসিক বিল

শীতের নিয়ম মেনেই এবারও পরিযায়ী পাখিদের ভিড়, কেবল কুলিক-গাজলডোবা- রসিকবিলই নয়, নারারথলি-সাগরদিঘিতেও জমজমাট। নিন্দুকদের মতে গাজলডোবায় পাখির সংখ্যা এবার কম। স্বভাবতই পক্ষীপ্রেমী লেন্সধারীরাও কেমন যেন রণে ভঙ্গ দিয়েছেন। তবে কোচবিহারের সাগরদিঘিতে পাখিদের ভিড়ে জনপ্রিয় বোটিং ব্যবস্থা বন্ধ রাখতে হয়েছে। আর রসিক বিলের খবর? সে খবর জানতেই ২৬ জানুয়ারি ছুটি পেয়ে সপরিবারে গিয়েছিলাম রসিক বিলের পথে। পরিস্থিতি এতটা শোচনীয় হবে ভাবিনি। তুফানগঞ্জ হয়ে রসিক বিল পৌঁছবার শেষ ১৩ কিমি পথ ভেঙেচুরে একাকার, শেষ কবে কাজ হয়েছিল বলা মুশকিল। গোটা এলাকা জুড়ে পিকনিক পার্টির বেসামাল তাণ্ডব, জমা জঞ্জালের কথা না বলাই ভাল। এ অবস্থায় পরিযায়ী পাখিদের হাল বর্ণনা না করাই বাঞ্ছনীয়। স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম গত ৫-৬ বছরে রসিক বিলের পরিবেশ ও সৌন্দর্য রক্ষা বা বৃদ্ধির জন্য ন্যূনতম কাজটুকুও হয়নি। কুঞ্জনগরের মতোই বনদপ্তরের কোনও কঠিন আইনের ফাঁদে পড়ে হয়ত মার খাচ্ছে অসাধারণ সুন্দর এই স্পটটি। অথচ একটা সময় রসিক বিল পর্যটক বা পক্ষীপ্রেমীদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি স্থান ছিল। বন উন্নয়ন নিগমের ইকো কটেজে থাকবার জন্য নিয়মিত আসত বাইরের পর্যটকরা। বলাই বাহুল্য সেখানেও ভাটা পড়েছে।

শান্তনু মাইতি

অন্য ভাবনায় অনুভব

একটু অন্য পথে হবে চলতে। ভাবতে হবে একটু ভিন্নভাবে। এমনটাই যেন অনুভব নাট্য সংস্থা গড়ে ওঠার জন্য তখন বড় কারণ ছিল। তখন মানে ২০০০ সালের কথা। খুব বেশি দিনের কথা নয়। আবার যাঁরা এই গ্রুপ থিয়েটার তৈরি করলেন, তাঁরা তো প্রায় প্রত্যেকেই নাট্যকর্মী ছিলেন। দীর্ঘদিন থেকেই নাট্য প্রযোজনা থেকে শুরু করে নাটকের অন্যান্য কাজের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন তাঁরা। তাহলে নতুন দল কেন?

আসলে অন্যভাবে বা ভিন্ন নাটক করার ইচ্ছে-স্বপ্ন-তাগিদ থেকেই পরিকল্পনা, আর

সংঘ সংস্কৃতির ডুয়ার্স

সেখান থেকেই জন্ম নেয় অনুভব নাট্য সংস্থা। দলের সম্পাদক অভিজিৎ ভট্টাচার্যর সঙ্গে দীর্ঘ আলাপচারিতায় এরকমটাই জানা-বোঝা গেল। প্রথম প্রযোজনা 'ঠিকানা' ও 'এখনও মানুষ' অনুভব নাট্যদলকে নতুন মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছিল শুরুতেই। এর পর এক-একটি সফল প্রযোজনার মধ্য দিয়ে তারা উত্তরবঙ্গে পরিচিতি লাভ করে। বিগত ১৫ বছরে অনুভব-এর ঝুলিতে রয়েছে ১২টি একাঙ্ক, ২টি পূর্ণাঙ্গ নাটক। এইগুলি ধারাবাহিক মঞ্চস্থ করা ছাড়াও বেশ কয়েকটি শ্রুতিনাটকও পরিবেশন করে তারা। ইতিমধ্যে অণুনাটক হয়েছে ৫টি। মোট ১৯টি নাটক, প্রদর্শন সংখ্যা এখনও পর্যন্ত ৬৯৪টি।

অনুভব নিয়মিত নাট্যচর্চার পাশাপাশি নিয়মিত নাট্য উৎসবের আয়োজন করে আসছে দলের সূচনালগ্ন থেকেই। একই সঙ্গে অনুভব সম্মাননা প্রদান হয় প্রতি বছর। এ বছর এই পুরস্কার পাচ্ছেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব দেবশংকর হালদার ও পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ন্যাস গ্রুপের কর্ণধার অরূপ গুহ। প্রতি বছর প্রকাশিত হয় অনুভব নাট্যোৎসব উপলক্ষে স্মারক পত্রিকা 'অনুভব'। এ বছর ১৮ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি এই

নাট্য উৎসব হবে কোচবিহার রবীন্দ্রভবন মঞ্চে।

অনুভব-এর সাম্প্রতিক প্রযোজনা 'ছায়াযুদ্ধ'। দলের নির্দেশক অশোক ব্রহ্ম বলেন, অনুভব বিশ্বাস করে, মঞ্চের জাগরণই দেশের জাগরণ। জন্মলগ্ন থেকে থিয়েটারের ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করে আসছে অনুভব। উল্লেখযোগ্য প্রযোজনাগুলির মধ্যে অন্যতম 'ঠিকানা', 'এখনও মানুষ', 'দরিদ্রনারায়ণ সেবা', 'স্মৃতির ফাঁদে', 'প্রতিবিম্ব'।

নিজস্ব প্রতিনিধি

সদ্যপ্রয়াত কথাকার জ্যোৎস্নেন্দু চক্রবর্তীর পঁচিশটি গল্পের সংকলন 'গল্প পঁচিশ'। লেখকের কোনও এককালে ফেলে আসা জীবন ধ্বনিত হয়েছে এই সংকলনটিতে। 'দিগন্ত বিসারি হাওর তার উপর রোদের প্লাবন'— পূর্ববাংলা জীবন্ত হয়ে ওঠে তার

নিজস্ব রূপ নিয়ে। প্রথম গল্প 'জন্মভূমি'। লেখক ফিরে গিয়েছেন তাঁর ফেলে আসা ঘরবাড়ি আর মাটির সন্ধানে। লেখকের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকও পৌঁছে যান সেই জল আর জলের দেশে। চোখে ভেসে ওঠে 'আলপনার মতো পানিফলের পাতা', দূরের হিজলবন, কচুরিপানার স্তূপের সঙ্গে ভেসে যাওয়া ফণা-তোলা বিষধর সাপ আর জলের প্রান্ত ছুঁয়ে প্রসারিত বিস্তৃত ফসলের মাঠ। এ যেন আমাদের চেনা পরিবেশের বাইরে এক মায়াময় জগৎ। পাঠক নিজের অজান্তেই সঙ্গী হয়ে যায় প্রকৃতির মতোই সরল এই মানুষদের সুখ-দুঃখ, জীবনযাপনের সঙ্গে। লেখক আশ্চর্য দক্ষতায় পরিচয় করান তাদের বসতবাড়ির সাধারণ ছবির সঙ্গে। 'ভাটি বাংলার বাড়িঘরের সামনে মাচা, পেছনে মাচা। ফুলের চেয়ে হরেকরকম ফল-ফলান্তির গাছই বেশি। আয়নার মতো তকতকে উঠোন। তার সীমান্তে পাকের ঘর এবং পাশেই সহোদরার মতো ঠেঁকি ঘর।'

গল্প পঁচিশ, জ্যোৎস্নেন্দু চক্রবর্তী, বইওয়ালা, মূল্য ২০০ টাকা

জীবনের বাইরে কোনও গল্পই হয় না। 'চোমং লামার ছোটগল্প' সেই জীবনেরই প্রতিফলন। তাঁর চরিত্রগুলির সুখ-দুঃখ, মান-অভিমান নিপুণ দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। গল্পগুলি পড়লেই বোঝা যায়, সমাজের বিভিন্ন স্তরের জীবনকে

খুব কাছ থেকে দেখেছেন। দেখেছেন আর অনুভব করেছেন নানা জীবনের মানসিক টানাপোড়েন, অস্তিত্বের সংকট। কখনও বা এর ভিতর দিয়ে উত্তরণের পথ। শহুরে ও গ্রাম্য জীবনের সংঘাত। আধুনিকতার নানা দিক উঠে এসেছে তাঁর চরিত্রগুলির মধ্যে। 'চোমং লামার ছোটগল্প' তাই দুই মলাটের ভিতর এক টুকরো সমাজ। 'জঙ্গলের রাস্তা', 'অরণ্যবাস', 'আশ্রয়', 'প্রশাখা', 'আকাশ-বসতি'— এইসব গল্পে যেমন উঠে এসেছে শহুরে ও গ্রাম্য জীবনের সংঘাত, তেমনি 'আবাদ' গল্পটি আমাদের চেনায় একটি নারীর চিরন্তন চাওয়া। অন্য দিকে 'পার্শ্বচরিত্র' গল্পটিতে সংস্কার ও কুসংস্কারের দ্বন্দ্বের ভিতর মানুষের মনের আলো ও অন্ধকারকে তিনি নিপুণভাবে এঁকেছেন। এরকমই আর একটি গল্প 'শ্মশানচাঁপা', সেখানে সংস্কার নয়, মানবতার মুখ দেখেছে পাঠক।

চোমং লামার ছোটগল্প; পুনশ্চ, মূল্য ৫০ টাকা

বইটি লেখকের বাছাই করা পঞ্চাশটি গল্পের এক সমৃদ্ধ সংকলন। বেশির ভাগ গল্পের মূল উপজীব্য বিষয় হল আধুনিক সমাজের ঘাত-প্রতিঘাত, সম্পর্কের টানাপোড়েন। সাধারণত আমরা দেখি বিভিন্ন চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক, ভাব আদানপ্রদানের ভিতর দিয়ে গল্প তার নিজস্ব গতিতে এগিয়ে চলে। কিন্তু এই সংকলনটিতে লেখক প্রতিটি গল্পকে একটু অন্যভাবে তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে

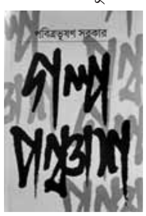

উপস্থিত করেছেন। অনেক ক্ষেত্রেই কথোপকথন বর্জিত নৈর্ব্যক্তিকতায় তিনি ঘটনার উপস্থাপন করেছেন। গল্পের বিস্তার ও সমাপ্তি ঘটিয়েছেন নৈর্ব্যক্তিকভাবে। আধুনিক সমাজের স্বার্থপর অমানবিক রূপটি গল্পকার এভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন নিখুঁতভাবে। আবার 'বাঘ' গল্পটিতে বনের পশু বাঘের বিপন্নতার করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। এই গল্পের সঙ্গে জঙ্গলের সরল আদিবাসী মানুষদের অস্তিত্বরক্ষার লড়াই মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। সংকলনটির শেষে তিনটি অণুগল্পে সমাজের ভাঙন এবং বঞ্চনার রূপটি অসাধারণভাবে এঁকেছেন।

গল্প পঞ্চাশ, পবিত্রভূষণ সরকার, একুশ শতক, মূল্য ১২৫ টাকা

সদ্য প্রয়াত জীবন সরকারের 'তিস্তাপারের ঘর সংসার' দুই মলাটের ভিতর দু'টি বড়গল্পের সংকলন। প্রথম গল্প 'নিউ বঙ্গাইগাঁও স্টোর্স'। এটি আসলে একটি দোকানের নাম। এই দোকানের সঙ্গে যুক্ত পরিবারটিকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে গল্পের বিষয়বস্তু। গল্পের ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে উঠে এসেছে আসামের ভয়ংকর জাতি-দাঙ্গা ও সংখ্যালঘু বাঙালি সমাজের বিপন্নতাবোধ, অস্তিত্বসংকট— এসব কিছু ছাপিয়ে বড় হয়ে ওঠে একটি নারীর আতঙ্ক। ঘর ভাঙার আতঙ্ক— সব হারানোর আতঙ্ক। 'তিস্তাপারের ঘর সংসার' গল্পের

নামের মধ্যেই নিহিত আছে গল্পের পটভূমি। গল্পের বিষয়বস্তু আবর্তিত হয়েছে পূর্ববাংলা থেকে এপার বাংলায় চলে আসা ছিন্নমূল মানুষজনের জীবনযাত্রা ঘিরে। ওইসব মানুষের জীবনযাপন, সুখ-দুঃখ ও চাওয়া-পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গল্প এগিয়ে চলে তার নিজস্ব গতিতে। তবে অসাধারণ কোনও চাওয়া-পাওয়া নয়, পরস্পরকে জড়িয়ে সাধারণভাবে বেঁচে থাকার আনন্দই পাঠকের হৃদয় ছুঁয়ে যায়।

তিস্তাপারের ঘর সংসার; জীবন সরকার, একুশ শতক, মূল্য ১০০ টাকা

শুক্লা রায়

পত্রপত্রিকা

ভোগা— রাজবংশী ভাষা আকাদেমি প্রকাশ করেছে রাজবংশী ভাষার পত্রিকা 'ভোগা'। আশ্বিন মাসের শেষ সন্ধ্যায় রাজবংশী সম্প্রদায় ঘরদুয়ার, খেতখামার যে আলো দিয়ে সাজায়, তাকে বলা হয় 'ভোগা'। ভিক্টর প্যালেস কোচবিহার থেকে প্রকাশিত এই সংকলনে

রাজবংশী ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে ৭টি প্রবন্ধ, ৪টি গল্প, একটি পালা। এ ছাড়াও কবিতা-নাটক ইত্যাদি। সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছে— 'রাজবংশী ভাষার উপুরা এতদিন কোনও সরকারি শিলমোহর না আছিল। তার বদল উলটোটায় আছিলেক। কোনওবেলা উমরা সরাসরি কোনওবেলা বা উমার নুন-খাওয়া মানষিলাক পাছিলাক নাগে দিয়া রাজবংশী ভাষা কওয়া, ভাষা লেখা মানষিলাক পত্রাগেলা করি দিছে। ...২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গত নয়া সরকার আসিয়া রাজবংশীলার এখেনা ছোট দাবিক মানি নিয়া উমার এখেনা বড় আশাক পূরণ করি দিল...।' সম্পাদক নিখিলেশ রায় আরও বলেছেন— 'রাজবংশী ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির আলো সউগ মানষিরঠে যায়া সমান করি পংছুক, আমার সগারে এইটায় কামনা।' রাজবংশী ভাষায় নাম নিয়ে লিখেছেন ড. গিরিজাশংকর রায়, রাজবংশী সাহিত্য নিয়ে লিখেছেন অশোক রায়প্রধান, সমসাময়িক রাজবংশী উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করেছেন ড. গিরীন্দ্রনাথ রায়। **নি.প্র.**

উচ্চমাধ্যমিকের কিছু মূল্যবান পরামর্শ

ফেব্রুয়ারির ঠিক মাঝবরাবর শুরু হচ্ছে ২০১৬-র উচ্চমাধ্যমিক। এক মাস পরীক্ষা এগিয়ে আসায় দুশ্চিন্তায় অনেকেই। ইংরেজি এবং অঙ্ক এই দুটি বিষয়ে নম্বর সহজেই বাড়তে পারে আবার সামান্য অসতর্কতায় কমে যেতে পারে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ডুয়ার্সের কৃতী শিক্ষকদের শেষ মুহূর্তের পরামশ দেওয়া হল।

ইংরেজি

১) ইংরেজি পরীক্ষাপর্বটিকে দুটো স্তরে ভাগ করে নেওয়া—

ক) প্রশ্নপত্রটি ভাল করে পড়ে বোঝা

খ) তারপর উত্তর লেখা

২) প্রথমে Part-B-র প্রশ্নগুলোর উত্তর করবে। এ জন্যে Multiple Choice ও Short Answer Type Ques.-গুলো ভাল করে পড়বে, তারপর সঠিক উত্তর সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নির্দিষ্ট নিয়মে উত্তরগুলো নির্দিষ্ট জায়গাতে লিখবে। মনে রাখবে, এই ক্ষেত্রে নম্বর থাকবে মোট ২০।

৩) তারপর Part-A-র প্রশ্নপত্রটি খুলে প্রত্যেকটি প্রশ্ন ভাল করে পড়বে। এই পর্বে দেখবে বেশ কিছু প্রশ্নে Part Ques. রয়েছে। উত্তরের জন্যে তোমরা এসব প্রশ্নকেই বেছে নেবে। কারণ, এতে নম্বর বেশি পাওয়া যায়। Part-A-তে থাকবে মোট ৬০ নম্বর।

Part-A-তে Part Ques. রয়েছে এমন প্রশ্নের উত্তর লিখতে গিয়ে প্রত্যেকটি Part-এর উত্তর আলাদা আলাদা Paragraph-এ লিখবে এবং প্রত্যেকটি Part-এর উত্তরের আগে বিশেষ কোনও চিহ্ন ব্যবহার করবে, যাতে পরীক্ষকের বুঝতে সুবিধা হয় এবং তিনি যেন বেশ খুশি হন।

আর প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর লেখার আগে Ques. No. তো দিতেই হবে।

উত্তর লেখার সময় কোনও ভুল নিয়ে থাকলে সেটি এমনভাবে কাটবে, যাতে লেখার সার্বিক সৌন্দর্য বজায় থাকে; কখনওই এমনভাবে কাটবে না, যাতে সমগ্র উত্তরটি বিশ্রী দেখায়।

৪) বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের নির্দেশনায় কখনও দু'টি, কখনও একটি প্রশ্নের উত্তর লিখতে বলা হয়। সে ক্ষেত্রে নম্বর বেশি উঠবে এমন প্রশ্ন নির্বাচনের পর যদি কেউ মনে করো যে দু'টির বেশি তিনটি বা একটির বেশি দু'টি প্রশ্নের উত্তর লিখবে— লিখতে পারো, সে ক্ষেত্রে যেটিতে নম্বর বেশি উঠবে, সেটিই সাধারণত গৃহীত হয়ে থাকে।

৫) Comprehension Test-এর ক্ষেত্রে যে Passage-টি দেওয়া থাকবে, সেটি বারবার মনোযোগ দিয়ে পড়বে ও সার্বিক অর্থ বোঝার চেষ্টা করবে। তারপর প্রত্যেকটি প্রশ্ন ভাল করে বুঝে নিয়ে উত্তর লিখবে। উত্তর যেন প্রাসঙ্গিক হয়— এ কথা সবসময় মনে রাখবে।

৬) Writing-এর ক্ষেত্রে Report/ Letter/Precis— যে কোনও একটির উত্তর লিখতে হবে। তবে Precis লেখা সবার পক্ষে সম্ভব নয়; শুধুমাত্র যারা ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী, তাদের পক্ষেই উপযোগী হবে।

৭) সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পরীক্ষা শেষ হওয়ার কমপক্ষে ১০ মিনিট আগে লেখা শেষ করবে। বাকি সময়টা Revision-এর জন্যে রাখবে। অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, Revision-এর ফলে প্রায়শই ৪/৫ নম্বর বেশি উঠে আসে।

৮) পরিশেষে Part-B-র উত্তরপত্রটি Part-A-র উত্তরপত্রের শেষের দিকে জুড়ে দেবে।

মনে রাখতে হবে- গদ্য ও পদ্যের উত্তর ১০০ শব্দের মধ্যে লিখতে বলা হয়। এ বিষয়ে তোমরা আগেই অভ্যাস করে দেখবে যে, তোমার হাতের লেখার ১০০ শব্দ কাগজের কতটুকু জায়গা নেয়। তবে শব্দসংখ্যা বেশিও হতে পারে বা কমও হতে পারে। তবে চিন্তার কিছু নেই— পরীক্ষকরা সাধারণত দেখে থাকেন তোমার উত্তরটি যথাযথ ও প্রাসঙ্গিক হল কি না— যদি তা পূরণ করতে পারো, তবে শব্দসংখ্যা বিষয়ে উদ্‌বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই।

রঞ্জিতকুমার চৌধুরী

অঙ্ক

উচ্চমাধ্যমিক ২০১৬ সালের জন্য সর্বপ্রথম পাঠ্যপুস্তকে যে ছয়টি ইউনিট আছে তা বিশদভাবে জেনে নেওয়া দরকার এবং প্রত্যেক ইউনিট থেকে কী ধরনের প্রশ্নাবলি হয় তা জেনে নেওয়া আবশ্যক। প্রথম বিভাগ বহু বিকল্পধর্মী, দ্বিতীয় বিভাগে অতিসংক্ষিপ্ত, তৃতীয় বিভাগে সংক্ষিপ্ত ও চতুর্থ বিভাগে দীর্ঘ উত্তরধর্মী প্রশ্ন থাকে। তাই প্রত্যেকটি অধ্যায়ের সমস্যাগুলি সমাধান করার ক্ষেত্রে সূত্রাবলি জেনে নেওয়া ও তাদের প্রয়োগ করার দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন।

ছাত্রছাত্রীদের যে সমস্ত বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া দরকার, সেগুলি হল—

প্রথমত, সমাকলন করে (অনির্দিষ্ট) অবশ্যই সমাকলন ধ্রুবক (Constant of Integration) যুক্ত করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, অবকলন ও সমাকলন করা হলে অবশ্যই 'অবকলন করে পাই', 'সমাকলন করে পাই' উল্লেখ করতে হবে। কোনও অপেক্ষকের উভয় পাশে লগারিদ্‌ম (Log) নিলে তা পাশে লিখতে হবে।

তৃতীয়ত, রৈখিক প্রোগ্রাম বিধি ও ক্ষেত্রফল রূপে নির্দিষ্ট সমাকলের যে লেখচিত্রের প্রয়োজন হয় তা অবশ্যই পেনসিল দিয়ে আঁকা আবশ্যক।

চতুর্থত, অধ্যায়গুলি রপ্ত করার আগে ছাত্রছাত্রীদের সংজ্ঞা ও সূত্রাবলি সংবলিত 'সংক্ষিপ্তকরণ' বা 'প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি একনজরে' জেনে নেওয়া দরকার।

পঞ্চমত, ভেক্টরের অঙ্ক করার সময় অবশ্যই ভেক্টর চিহ্ন দিতে হবে।

ষষ্ঠত, রাফ, খাতার একটি নির্দিষ্ট পাতায় করা দরকার অথবা খাতার পাতায় ডান দিকে দাগ টেনে করা দরকার।

সপ্তমত, উত্তরগুলি প্রশ্নের ক্রম অনুযায়ী করার চেষ্টা করলে ভাল হয়।

অষ্টমত, পরীক্ষা প্রস্তুতি এমন হবে, যাতে পরীক্ষার সময় ১৫-২০ মিনিট পাওয়া যায় উত্তরগুলি সঠিক হল কি না অর্থাৎ Notation, চিহ্ন, Bracket, Sign যথাস্থানে দেওয়া হয়েছে কি না দেখার জন্য।

নবমত, পরীক্ষা চলাকালীন কোনও প্রশ্নে আটকে গেলে সময় নষ্ট বা মাথা গরম না করে অন্য প্রশ্নে মনঃসংযোগ করা প্রয়োজন এবং পরে ওই প্রশ্নে আসা যেতে পারে।

দশমত, স্বাভাবিক সংখ্যা (N), অখণ্ড সংখ্যা (Z), বাস্তব সংখ্যা (R) ইত্যাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নগুলিকে Bold করে দেওয়া যায়।

পরিশেষে, ছাত্রছাত্রীরা যেন প্রশ্নপত্রটিকে ভালভাবে পড়ে নিয়ে উত্তরপত্রে উত্তর লেখে। আশা করি, Suggestion-গুলি ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা প্রস্তুতিতে সহায়তা করবে।

স্নেহাশিস ঘোষ

শখের শেখা

টবে ফুল গাছ কয়েকটি টিপস

গাছ কার না ভাল লাগে? রংবেরঙের ফুল, পাতাবাহার দিয়ে নিজের ছোট্ট অব্যবহৃত স্থান আপনিও ভরিয়ে তুলতে পারেন। বাড়ির কার্নিস, ছাদ, বারান্দা, কলতলা, সিঁড়ি সর্বত্র কাজে আসতে পারে। মাটিতে বা টবে আপনার বাসনা পূরণ করতে পারেন। আজকাল হরেকরকম টব সুলভে পাওয়া যায়। মাটির টব, প্লাস্টিকের টব, এমনকি সিমেন্টেরও টব বাজারে পাওয়া যায়। গাছের প্রকৃতি অনুযায়ী টবের সাইজ নির্বাচন করা উচিত। ছয় ইঞ্চি ব্যাস থেকে চব্বিশ ইঞ্চি ব্যাসের টব ব্যবহার করা যায়।

টবে গাছ লাগানোর আগে অবশ্যই তলায় এক ইঞ্চি পুরু করে খোলামকুচি দেবেন, তারপর এক ইঞ্চিমতো বালি দেবেন। এর পর মাটি দিয়ে টব ভরতি করুন। খেয়াল রাখবেন, টব যেন পুরোটাই মাটি দিয়ে ভরতি না হয়। এক ইঞ্চিমতো খালি যেন থাকে। ঝুরো মাটি দেবেন। পাতা-পচা সার, গোবর সার দিলেই হবে। রাসায়নিক সার ব্যবহার না করাই ভাল। যাঁরা নতুন করে গাছ লাগাবেন, তাঁরা গজানিয়া ও চন্দ্রমল্লিকা দিয়ে শুরু করতে পারেন।

গজানিয়া- খুব ছোট্ট অথচ এত বাহারি ফুল যে এর দোসর খুঁজে পাওয়া শক্ত। পাপড়িতে এত কারুকার্য থাকে, মনে হয় যেন কোনও শিল্পী রং-তুলি দিয়ে এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন। যে কোনও নার্সারি থেকে ছোট চারা কিনে আনুন, ডিসেম্বর থেকে মরশুম শুরু। চলবে মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত। আট-দশ টাকা/পিস নেবে দাম। গোটা দশেক লাগিয়ে দেখুন। একটার পর একটা ফুল দু'-তিন মাস পেয়ে যাবেন।

চন্দ্রমল্লিকা- একবার লাগালেই নিশ্চিন্ত। প্রথমবার রং এবং সাইজ দেখে নার্সারি থেকে চারা কিনুন। অক্টোবর থেকে মরশুম শুরু। চলবে গরম শুরু পর্যন্ত। বল ভ্যারাইটি ও পমপম ভ্যারাইটির চন্দ্রমল্লিকা হয়। পরের বার ওই চারা থেকেই আপনি নতুন চারা পেয়ে যাবেন। যে কোনও সারের দোকান থেকে কাটিং অ্যান্ড পাউডার এনে নতুন ডাল কেটে লাগিয়ে ভিজে বালিতে পুঁতে দেবেন। সপ্তাহখানেক পরে দেখবেন শিকড় এসে গিয়েছে। তারপর মাটিতে বা টবে লাগান।

কৃষ্ণচন্দ্র দাস

স্প্যানিশ গিটার শিখে স্মার্ট !

এখনকার ইয়াং জেনারেশনের হারমোনিয়াম ততটা পছন্দ নয়। তাদের চাই স্প্যানিশ গিটার। তাই শখের কথা এলে স্প্যানিশ গিটার যে প্রায়রিটি পাবে, তাতে আর সংশয় কী! শুধু যে ওয়েস্টার্ন মিউজিক তা-ই বা কে বলল! এখন তো ফোক, আধুনিক, সেমিক্লাসিক্যাল— সব কিছুতেই গিটার অত্যন্ত ভাইটাল। আর ফিউশনের যুগে কি গিটার ছাড়া গানবাজনা হয়?

কথা হচ্ছিল স্প্যানিশ শিল্পী শুভদীপ রায়ের সঙ্গে। শুভদীপ বললেন, 'গিটার হল মোস্ট ভার্সেটাইল ইনস্ট্রুমেন্ট। ওয়েস্টার্ন মিউজিক পপ জ্যাজ রক ব্লুজ রেগে কান্ট্রি ফোক-এর বিস্তৃত জগতে ঢুকতে পারলে কী অসাধারণ আনন্দ তা একজন গিটারিস্ট ফিল করতে পারেন! ভারতীয় সংগীতেও স্প্যানিশ গিটারের ব্যবহার এখন ক্রমে বাড়ছে। তাই গিটারিস্টদের চাহিদাও ক্রমে বাড়ছে।'

পৌঁছে গেলাম শুভদীপের গিটার ক্লাসে। 'খুব কঠিন এই শখ মেটানো?'

—মোটেও না। শুধু প্রয়োজন আর একটু মিউজিক সেন্স।— শুভদীপ হাসতে হাসতে বললেন।

—কী করতে হবে প্রথমে?

—একটা ডিসেন্ট গিটার কেনা প্রয়োজন। ইন্ডিয়া-মেড হলে দুই থেকে চার হাজারেই মিলবে, বিদেশি হলে পাঁচ হাজার থেকে শুরু। তারপর গিটারকে চিনতে হবে ভালভাবে। তা ধরবার কায়দা আয়ত্তে আনতে হবে। সুরে বাঁধা শিখতে হবে। কোনওটাই মোটেও কঠিন নয়।

পিকিং হ্যান্ড (সাধারণত ডান হাত) এবং প্লেয়িং হ্যান্ড (সাধারণত বাঁ হাত) এক্সারসাইজ চলবে ক'দিন। তারপর ওপেন কর্ড শিখতে হবে। ক্রমে বার কর্ড স্কেল ইত্যাদি শিখে নিতে হবে। ওয়েস্টার্ন স্টাফ নোটেশন বা স্বরলিপি সম্পর্কে ঠিকঠাক ধারণা তৈরি করতে হবে। স্কেল অ্যাপ্লাই করে গান বাজাতে হবে।

—গিটার শিখে কী কী পথ খুলতে পারে?

শুভদীপ জানালেন, '১) একক মিউজিকের প্রোগ্রাম করা যেতে পারে। সোলো আর্টিস্ট হিসেবে নামডাক হতে পারে। ২) নিজস্ব মিউজিক ব্যান্ড তৈরি করা যেতে পারে। ৩) মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্ট করার স্কোপ তৈরি হয়। ৪) অন্য শিল্পীর সঙ্গে সংগত করার প্রভূত সুযোগ। ৫) রয়েছে গিটার শেখাবার সুযোগ। ৬) গিটার বাজিয়ে নিজে গান গাইবার সুযোগ রয়েছে। খুব স্মার্ট লাগে এতে।'

ইদানীং গিটারিস্টদের কদর বাড়ছে। সঙ্গে সাম্মানিক। সাধারণ আধা শহর গ্রামগঞ্জে অর্কেস্ট্রায় বাজিয়ে এক রাতে পাঁচশো থেকে হাজার-দু'হাজার টাকা পর্যন্ত উপার্জন হতে পারে। থাকে সোলো প্রোগ্রামের সুযোগ। মুম্বই কলকাতার অনেক নামী গাইয়ে উত্তরবঙ্গে অনুষ্ঠান করতে এসে স্থানীয় বাদকদের নিয়ে গান করেন। ভাল গিটারিস্ট সেসব অনুষ্ঠানে বাজাতে পারেন। শুভদীপ নিজে শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ আরও অনেকের সঙ্গে বাজিয়েছেন। এর সঙ্গে সিটি সেন্টারে সোলো ওয়েস্টার্ন মিউজিক বাজিয়েছেন।

তিনি জানালেন, একজন আগ্রহীর খুব বেশি দিন লাগে না। ছ'-সাত মাসের মধ্যেই বাজনা হাতে চলে আসে। শুভদীপের কাছে তালিম নিয়ে ক্রমেই কনফিডেন্ট হয়ে উঠছে সম্রাট, সঞ্জয়, দেব, সৌপালীরা।

সৃজন বিশ্বাস

দিন দিন দূষণ যা বাড়ছে, সকলেই ত্বক নিয়ে যথেষ্ট চিন্তিত। ত্বকের যত্ন করতে চান না এমন মানুষের সংখ্যা বোধহয় খুব কম। ব্রণ, চোখের নিচে কালো দাগ, গোড়ালি ফাটা— ত্বকের এসব সমস্যাকে দূরে সরিয়ে কীভাবে পাওয়া যেতে পারে সুন্দর, ঝকঝকে ত্বক, জেনে নেওয়া যাক ঘরোয়া কিছু উপায়।

ত্বকের যত্নে ঘরোয়া টিপস

ব্রণ একটি বড় সমস্যা

❑ রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে অল্প লেবুর রস ও মধু আর দারচিনি বাটা একসঙ্গে মিশিয়ে মুখে লাগিয়ে বিছানায় যান। সকালে উঠে ভাল করে মুখ ধুয়ে ফেলুন।

❑ কয়েকটি শুকনো নিমপাতা জলে ধুয়ে বেটে নিন। একটি বাটিতে মুলতানি মাটি, সামান্য হলুদ, দুধের উপরের অংশ মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন। এবার সেটি মুখে লাগিয়ে ১৫ মিনিট রেখে মুখ ধুয়ে ফেলুন।

❑ মোসাম্বি আর কমলালেবুর খোসা গুঁড়োর সঙ্গে মধু আর ছাতু দিয়ে তৈরি পেস্ট ত্বকে লাগিয়ে রাখলে ত্বক যেমন পরিষ্কার হয়, একই সঙ্গে পুষ্টিও পায়। শুকিয়ে যাওয়ার পর সেই প্যাক ধুয়ে ফেলতে হয়।

❑ ত্বককে ব্রণর হাত থেকে মুক্ত রাখার জন্য বাষ্প খুব সহায়তা করে।

ব্রণর দাগ

ব্রণ ঠিক হওয়ার পর থেকে যায় বিশ্রী দাগ। টেনশন নেই। উপায় আছে।

❑ প্রচুর পরিমাণে জল খেতে হবে। এতে ত্বকের সঠিক আর্দ্রতা বজায় থাকে।

❑ চালের গুঁড়োর সঙ্গে টক দই মিশিয়ে ব্রণর দাগগুলির উপর লাগালে উপকার পাওয়া যাবে।

❑ রশুনের কোয়া নিয়ে দাগে ঘষা যেতে পারে। এর পরপরই বরফের টুকরো ঘষতে হবে ওই একই জায়গায়।

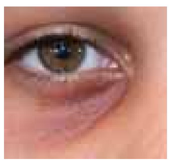

❑ ডিমের সাদা অংশ মুখে দশ-পনেরো মিনিট লাগিয়ে রেখে মুখ ধুয়ে ফেলতে হবে। এতে ত্বকের অয়েল ব্যালান্স বজায় থাকে ও দাগ কমে যায়।

চোখের নিচে কালো দাগ

ছোট থেকে বড়, টিনএজার থেকে বয়স্ক মহিলাদের প্রায় প্রত্যেকেরই নিত্য সমস্যা ডার্ক সার্কল। পড়াশোনা, পরীক্ষা, রেজাল্ট, অ্যাডমিশন, কর্মক্ষেত্রে ঝামেলা, সাংসারিক টেনশন— নানান প্রেশার চারপাশে। এই চাপই দায়ী ডার্ক সার্কলের জন্য। এর জন্য প্রথম প্রয়োজন—

❑ নিজেকে চাপমুক্ত রাখা।

❑ প্রতিদিন অন্তত দু'লিটার জল খাওয়া।

❑ ৮ ঘণ্টা ভাল ঘুম দরকার।

❑ শসা এবং আলু থেঁতো করে কিছুক্ষণ রেখে ধুয়ে ফেলতে হবে।

❑ লেবুর রস লাগানো যেতে পারে এবং সঙ্গে আমন্ড অয়েল।

❑ ব্যবহার করা টি-ব্যাগ দিয়ে চোখে হালকা মাসাজ করলেও ভাল ফল পাওয়া যাবে।

❑ পুদিনাপাতার রস করে লাগালেও ডার্ক সার্কল হালকা হয় ও চোখ ঠান্ডা থাকে।

পৌলোমী গঙ্গোপাধ্যায়, হ্যামিলটনগঞ্জ

তক্কাতক্কি

প্রেম আমাদের বাঁচতে শেখায়

'প্রেম'— এক শাশ্বত অনুভূতি। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই বড়ই রহস্যময় এই শব্দ। শরীর ও মনে এক অদ্ভুত অনুরণন সৃষ্টি করে। বহুল ব্যবহৃত এই শব্দ 'প্রেম' বড্ড প্রাচীন এবং একই সঙ্গে আধুনিকও। প্রেমের উৎস্য কী এবং কোথায়? এই প্রশ্ন আমাদের সবার মনে। আমার মনে হয় প্রেম আছে আমাদের জীবনে, শরীরে, স্বপ্নে ও কল্পনায়। প্রেমই আস্তাকুঁড়েকে স্বর্গ বানায়। প্রেম শরীরের বাইরে নেই, আবার শুধু শরীরও প্রেম নয়। প্রেম আমাদের শরীর ও মনকে চরম অবক্ষয় থেকে, হতাশা থেকে টেনে তুলে নতুন করে স্বপ্ন দেখায়, বাঁচতে শেখায়। তবে কামনা আর প্রেম দুটি হচ্ছে সম্পূর্ণ আলাদা। কামনা একটা প্রবল উত্তেজনা মাত্র আর প্রেম হচ্ছে ধীর, প্রশান্ত ও চিরন্তন। সম্পর্কের গোড়ার কথাই হল প্রেম। প্রেম না থাকলে তো সম্পর্কের অগ্রগতিই হবে না। প্রেম শুধুমাত্র শরীরসর্বস্ব খেলা কখনোই হতে পারে না। প্রেমের হাত ধরেই মনোবীণায় ঝংকার তোলার শুরু— সে দাম্পত্যেই হোক বা প্রেমিক প্রেমিকার সম্পর্কেই হোক। প্রেমের যদি গভীরতা না থাকে তাহলে প্রথমে তা মোহজাল ও পরে তা শরীরসর্বস্ব খেলায় রূপান্তরিত হয়ে নিমেষেই শেষ হয়ে যাবে। স্বল্পায়ু হবে তার ক্ষণ। তাই তো আজ সমাজে রোম্যান্টিক কাপল-এর খুব অভাব হয়ে গিয়েছে। যেন অভ্যাসবশত স্বামী-স্ত্রী তাদের বন্ধন বয়ে নিয়ে চলেছে। প্রেমের উপর আস্থার অভাব থেকেই সেপারেশন বেড়ে গিয়ে সম্পর্কের দাঁড়ি টানাও ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।

তিয়াসা সেন, শিলিগুড়ি

কোনও কোনও পুরুষকে ঘৃণ্য ধর্ষণে লিপ্ত করতে মেয়েদের ছোট পোষাক কতখানি দায়ী? আপনার মতামত জানান 'তক্কাতক্কি'তে। মতামত হতে হবে অনধিক ২০০ শব্দ। মনোনীত মতামত প্রকাশিত হবে আমাদের মার্চ সংখ্যায়। লেখা পাঠানোর ঠিকানা— 'শ্রীমতী ডুয়ার্স', প্রযত্নে- **'এখন ডুয়ার্স', মুক্তাভবন (দোতলা), মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১। অথবা ই-মেল করুন— srimati.dooars @gmail.com**

ভ্রমসংশোধন

গত ১৫ জানুয়ারি ২০১৬ 'এখন ডুয়ার্স' সংখ্যায় প্রকাশিত 'পরশখানি দিয়ো' প্রতিবেদন-এ প্রতিবেদকের নাম ভুলবশত শাঁওলি দে-র পরিবর্তে শ্বেতা সরখেল ছাপা হয়েছিল। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

সিলেবাসের বাইরে পড়ুয়াদের জন্য প্রকৃতির পাঠ হোক আবশ্যক

স্কুল সিলেবাসের বাইরে পড়ুয়াদের জন্য থেকে যায় অন্য এক পাঠ। সেই পাঠ নিতে ঘরের বাইরে যেতে হয় ছেলেমেয়েদের। বেড়ে ওঠার জন্য প্রকৃতির মুক্ত পরিবেশে নানা বয়সি বন্ধুদের সঙ্গে থেকে সেই পাঠ নেওয়াটা বেড়ে ওঠার জন্য জরুরি। কারণ সেখানেই সে জেনেবুঝে নিতে পারে নিজেকে এবং তার চারপাশ।

ক্যাম্প ফায়ারের দিন নিমন্ত্রণ ছিল অভিভাবকদের। গেলাম আমরা। সুনতালা খোলার কাছাকাছি সুন্দরে বস্তিতে একটি স্কুলের মাঠে HNAF আয়োজিত অ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্পে, যেখানে আমাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছিল বড় দাদা-দিদিদের সঙ্গে। গাইডদের 'দাদা' বলেই ডাকার নিয়ম। আমার ৮ বছরের ছেলের আর ৬ বছরের মেয়ের মুখে 'অনিমেষদা' (অনিমেষ বসু) ডাক শুনে একটু হকচকিয়েই গিয়েছিলাম প্রথমটায়। পরে জানলাম, এটাই ক্যাম্পের অলিখিত নিয়ম। প্রতি বছরই ২৫ থেকে ২৯ ডিসেম্বর অনূর্ধ্ব ১৫ ছেলেমেয়েদের নিয়ে এই ক্যাম্পের আয়োজন করে HNAF (Himalayan Nature and Adventure Foundation) গত ৩১ বছর ধরে। এও জানলাম, ১৯ থেকে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলে ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড শিশু-কিশোরদের নিয়ে আরও একটি ক্যাম্প। সেখানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ছোটরা আসে প্রকৃতির সঙ্গে একেবারে লেপটে থাকতে।

রাস্তার ধারে গাড়ি রেখে উঠে গেলাম বিশাল মাঠের প্রবেশদ্বারের কাছে। ঢুকে একটা অদ্ভুত আবেগ কাজ করল। বুঝলাম, ওদের বেড়ে ওঠার সময় আমরা বাবা-মায়েরা যা ওদের দিতে পারি না, তা এখানে এসে ওরা পেয়েছে। তাই আমাদের দেখেও হুড়মুড় করে এগিয়ে তো এলই না, বরং দূর থেকে হাত নেড়ে বুঝিয়ে দিল, ব্যস্ত। কী অসম্ভব ভাললাগা অনুভব করলাম, সে বলার নয়। তাকিয়ে দেখলাম, বিশাল মাঠের সম্পূর্ণ সীমান্ত এমনভাবে ঘেরা, যাতে ক্যাম্পাররা কোনওমতেই বাইরে বেরতে না পারে।

প্রবেশ ও বাহির পথে লাগানো আছে বোর্ড— out of bound, মানে এর পর এগতে হলে অনুমতি প্রয়োজন। প্রত্যেকে সেটা মেনে চলছে কোনওরকম ব্যতিক্রম ছাড়াই। মাঠের সীমান্ত লাগোয়া অঞ্চল জুড়ে বানানো রয়েছে ষোলোটি টেন্ট। এগুলোর মধ্যে একটি অফিস, একটি মেডিক্যাল আর বাকিগুলোতে ক্যাম্পারদের থাকার ব্যবস্থা। প্রতি টেন্টে

দু'জন করে গাইড। যেহেতু প্রকৃতির সঙ্গে মেলামেশা, তাই তাঁবুগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে ডুয়ার্সের নদীর নামে— সংকোশ, রায়ডাক, জলঢাকা, কালজানি, নেওড়া, মূর্তি, সুনতালা খোলা, আশালি খোলা, ডায়না, চেল, লিশ, ঘিস, তিস্তা ও তোর্সা।

সব ক্যাম্পারকে মোট সাতটা দলে ভাগ করে নেওয়া হয়েছিল বয়স এবং অভিজ্ঞতা অনুযায়ী। যেমন— ছোটরা Rabbit Gr. (৩/৪ বছর থেকে ৫/৬ বছর), তারপর Panda Gr., Leapord Gr., Tiger A, Tiger B, Tiger C এবং ১৪/১৫ বছর বয়সি যারা, তারা Pioneer Gr.। এদের সঙ্গে অন্তত ৪০ জন গাইড, যাঁরা সর্বক্ষণ তাঁদের টিমের ক্যাম্পারদের আগলে রাখছেন এবং গাইড করছেন।

প্রতিদিন ভোর সাড়ে পাঁচটায় বেড টি দিয়ে জাগানো হয় ক্যাম্পারদের। তারপর পি.টি., উপস্থিতি গুনতি, ছোলা-গুড় খেয়ে শুরু হয়ে যায় রোজকার কার্যকলাপ। গাইডরা যে যাঁর টিম নিয়ে বাইরে চলে যান। দড়ি দিয়ে বানানো ব্রিজ (বার্মা ব্রিজ) পেরনো, স্পাইডার'স নেট টপকানো, কৃত্রিম রক ক্লাইম্বিং, ট্রেকিং এবং সেই সঙ্গে ট্রেকিং-এর নিয়মকানুন, নানারকম নট শেখানো ইত্যাদি। বিভিন্নরকম অ্যাডভেঞ্চারের আকর্ষণে ও উত্তেজনায় ক্যাম্পাররা প্রতিদিন বুঁদ হয়ে থাকে।

এখানে একটি মজার ব্যাপার দেখলাম। Rabbit Gr.-এর খুদেদের ১২ জনের নামকরণ করা হয়েছে ইংরেজি বারোটি মাসের নামে। আমার কন্যার নাম ছিল অগাস্ট। দেখলাম ডিসিপ্লিন। উপস্থিতি গুনতির লাইনে মাথায় ক্যাম্প ক্যাপ ছিল না দু'জনের মাথায়। লাইন থেকে বার করে দেওয়া হল তাদের। গাইডরা তাড়াতাড়ি কোঅপারেট করে টুপি মাথায় দেওয়ার ব্যবস্থা করল। প্রত্যেকে তটস্থ। সকলের মাথার উপর অদৃশ্য দু'টি চোখ পর্যবেক্ষণ করছে যেন। সেই চোখ দু'টি স্বয়ং অনিমেষ বসুর। দু'শোজনের একটি দল অথচ এক চুল ত্রুটি নেই কোথাও। নানান ব্যবস্থাপনার মধ্যে আছে স্যানিটেশন ম্যানেজমেন্ট, কুকিং ম্যানেজমেন্ট, ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি দপ্তর। প্রত্যেকেই যে যার কাজে অত্যন্ত দক্ষ এবং পরিপাটি। প্রতিটি ক্ষেত্রই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যসম্মত।

ছোটদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য ক্যাম্পে যোগ দেন বিভিন্ন রিসোর্স পার্সন। এবারে এসেছিলেন দেবাশিস বিশ্বাস, যিনি তাঁর নিজের এভারেস্ট আর কাঞ্চনজঙ্ঘা জয়ের অভিজ্ঞতার গল্প শোনালেন ছোটদের। ছোটরা অভিভূত হয়ে দেখেছে আর শুনেছে একজন এভারেস্ট বিজয়ীর কাহিনি। ছিলেন রাজীব মণ্ডল, যিনি সম্পূর্ণ হিমালয় রেঞ্জ এক বছর ধরে হেঁটে পেরিয়েছেন কঠিন ঝড়ঝাপটা আর বাধাবিঘ্নকে জয় করে। ছিলেন দেবরাজ দত্ত। তিনিও কাঞ্চনজঙ্ঘা বিজয়ী। শুধু কাঞ্চনজঙ্ঘাই নয়, বেশ কয়েকটি এমন শৃঙ্গও জয় করেছেন, যা ভারতবাসী হিসেবে তিনিই প্রথম। এইসব মানুষের সমাবেশ এবং সাহচর্য সত্যিই ক্যাম্পারদের মনের ভেতর আলোড়ন তোলে।

সব মিলিয়ে বলতে হয়, ছোটদের সঙ্গে প্রকৃতির এই যে যোগাযোগ ঘটানোর প্রচেষ্টা, তা দেখে একজন মা হিসেবে বারবারই মনে হয়েছে, আরও বেশি বেশি খুদেরা ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করুক, যাতে গতানুগতিক লেখাপড়ার বাইরে পৃথিবীর একটি অন্য দিক তাদের সামনে উন্মোচিত হতে পারে।

মৌসুমী দাস, জলপাইগুড়ি

টেক টক

অনলাইনে আপনার ব্যক্তিগত তথ্য আদৌ সুরক্ষিত থাকে না

ফেসবুক টুইটার সহ সব ধরনের সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং অ্যাকাউন্ট ও মেল অ্যাকাউন্টের উপরই নজরদারি রয়েছে তা জানেন কি? তবে চারপাশের ওইসব নজরদারির পরও আপনি অনলাইনে নিজের প্রাইভেসি সুরক্ষিত রাখতে পারেন। কীভাবে? জেনে রাখুন সহজ কিছু প্রযুক্তিগত পদ্ধতি।

আমরা যখন কোনও সাইটে ক্লিক করি, তখন একাধিক দেশের সংস্থা ও সরকার আমাদের উপর নজরদারি চালায়। আমরা কোন লিঙ্কে ক্লিক করছি, কোন সাইট কতক্ষণ ভিজিট করছি, কোন আইপি অ্যাড্রেস থেকে আমরা নেট সার্ফ করছি, আমরা যে ডিভাইস ব্যবহার করে নেট সার্ফ করছি, তার জিয়োগ্রাফিক্যাল লোকেশন কী ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের দেশে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং আইআইটি-তে গুগ্‌ল মেল-এর পরিবর্তে ভারত সরকারের নিজস্ব মেল পরিষেবা ব্যবহার করা হয়। জি-মেলের সার্ভার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তাই আপনি জি-মেল ব্যবহার করলে হয়ত সে দেশের সরকার বা কোনও সংস্থা আপনি কাকে কী মেল করছেন তা জানতে নজরদারি চালাবে। আর যদি ভারতের মেল পরিষেবা ব্যবহার করেন, সে ক্ষেত্রে হয়ত আমাদের দেশের সরকারই আপনার উপর নজরদারি চালাবে। বিশ্বের যে সমস্ত দেশ তাদের নাগরিকদের ফেসবুক, টুইটার-সহ বিভিন্ন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং অ্যাকাউন্ট ও মেল অ্যাকাউন্টের উপর নজরদারি চালায়, তাদের মধ্যে ভারত অন্যতম।

চারদিকে এত নজরদারির মধ্যে কীভাবে আপনি অনলাইনে নিজের প্রাইভেসি সুরক্ষিত রাখবেন? গুগ্‌ল ক্রোম এবং ফায়ারফক্স ব্রাউজারে বেশ কিছু এমন অ্যাড অন রয়েছে, যাদের সাহায্যে আপনি আপনার মেলের উপর নজরদারি কিছুটা হলেও কমাতে পারবেন। গুগ্‌ল ক্রোমে এমন একটি এক্সটেনশন হল Mailvelope। ব্রাউজারে এই এক্সটেনশনটি ইনস্টল করে নিলে সেটি আপনার ওয়েব মেল সার্ভিসকে Open PGP (Pretty Good Privacy) নিরাপত্তা দেবে।

এ ছাড়া ক্রোম ব্রাউজারে আরও একটি এক্সটেনশন রয়েছে, সেটি হল Secure Gmail। এই এক্সটেনশনের সাহায্যেও আপনি আপনার মেলকে এনক্রিপ্ট করতে পারবেন। তবে যাঁকে মেলটি পাঠাবেন, তাঁকেও তাঁর ব্রাউজারে এক্সটেনশনটি ইনস্টল করতে হবে, না হলে তিনি মেলটি পড়তে পারবেন না।

ফায়ারফক্স ব্রাউজারেও এমন একটি এক্সটেনশন রয়েছে, যার নাম Encrypted Communication। এ ছাড়া কিছু ই-মেল সার্ভিস রয়েছে, যারা গুগ্‌ল মেল অর্থাৎ জি-মেল বা ইয়াহু মেলের মতো অত জনপ্রিয় নয়, কিন্তু তাদের শক্তিশালী ইনবিল্ট এনক্রিপ্টেড ফিচার রয়েছে। এমন দু'টি মেল সার্ভিস হল Hushmail এবং Mykolab। Hushmail আপনাকে ফ্রি-তে অ্যাকাউন্ট

খোলার সুবিধা দেবে, কিন্তু ফ্রি পরিষেবায় আপনি তাদের সমস্ত PGP পরিষেবা পাবেন না।

সমস্ত সুবিধা পেতে হলে আপনাকে পেইড অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। অনেক সময় আমরা বিভিন্ন ওয়েবসাইটে অনলাইন ফর্ম ফিল-আপ করার সময় নিজেদের মেইল আইডি দিই। সে ক্ষেত্রে আমাদের মেইল আইডি বিভিন্ন সংস্থা জেনে যায় এবং পরবর্তীতে আমাদের মেল অ্যাকাউন্ট স্প্যাম মেলে ভরে যায়।

যাদের মেল অ্যাকাউন্ট রয়েছে, তাদের প্রায় প্রত্যেকেরই অভিযোগ রয়েছে স্প্যাম মেল বা বিভিন্ন সংস্থা থেকে আসা অপ্রয়োজনীয় বাণিজ্যিক মেল নিয়ে। স্প্যাম মেল ঠেকানো তথা অনলাইন নিজের মেল আইডি প্রাইভেসি রক্ষার জন্য সেরা উপায় হল DEA (Disposable Email Address)। এটি হল অ্যানোনিমাস ও টেম্পোরারি মেল আইডি এবং কার্যকারিতায় OTP (One Time Password)-র মতো। আপনি প্রয়োজনমতো DEA ক্রিয়েট করতে পারবেন এবং যে কাজের জন্য DEA ক্রিয়েট করেছেন, সেই কাজ হয়ে গেলে মেল অ্যাড্রেসটি ডিলিট করে দিতে পারবেন। এইভাবে আপনি অনলাইন নিজের প্রকৃত মেল আইডি-র প্রাইভেসি রক্ষা করতে পারবেন।

DEA পরিষেবা দেয় Guerrila Mail, Mailinator-সহ বেশ কিছু সংস্থা। DEA সাধারণত একবার বা দু'বার ব্যবহার করা যায়। এ ছাড়া এই মেল অ্যাড্রেস মূলত নিজের প্রকৃত মেল আইডি গোপন রাখার জন্যই ব্যবহার করা হয়। DEA-র সিকিউরিটি সিস্টেম খুবই দুর্বল। তাই এই মেল অ্যাড্রেস ব্যবহার করে কখনওই কাউকে গুরুত্বপূর্ণ কোনও মেল পাঠাবেন না।

এবার আসি সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটের কথায়। ফেসবুক-সহ বিভিন্ন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট আমাদের ডিজিটাল লাইফের মতো তথ্য যে গোপনে স্টোর করে রাখে, তা জানলে আপনি চমকে উঠবেন। ফেসবুকের উদাহরণ দিচ্ছি। ফেসবুকে নিজের অ্যাকাউন্টে লগ ইন করার পর সেটিংস পেজে যান। এই পেজের একেবারে নিচে দেখবেন লেখা রয়েছে, 'Download a copy of your facebook data'। এই লিংকে ক্লিক করলে যে তথ্যগুলি পেজে আসবে, সেগুলি দেখে আপনি চমকে উঠবেন। সেই সমস্ত তথ্যর মধ্যে রয়েছে আপনি ফেসবুকে কখন কাকে পোক করেছেন, কোন কোন ইভেন্ট অ্যাটেন্ড করেছেন, কবে কোন কম্পিউটার বা মোবাইল ডিভাইস থেকে আপনি ফেসবুক অ্যাকাউন্টে লগ ইন করেছেন, সেই ডিভাইসের লোকেশন কী ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ এই সমস্ত তথ্য ফেসবুকের সার্ভারে জমা রয়েছে, যা ফেসবুক কোম্পানির পক্ষে দেখা মোটেই কঠিন নয়।

ইন্দ্রনীল দত্ত

অড়হর বেগুন

উপকরণ: অড়হর ডাল, বেগুন, ঘি, গরম মশলা, সাদা জিরে, তেজপাতা, শুকনো লংকা, নুন, হলুদ গুঁড়ো, সরষের তেল, ভাজা কাঁচা লংকা, চিনি।

প্রণালী: প্রথমে অড়হর ডাল শুকনো করে ভেজে নিতে হবে। তারপর ভাজা ডাল সেদ্ধ করতে হবে। এর পর সেদ্ধ ডালকে গরম জলে গুলতে হবে। এবার কয়েক টুকরো বেগুন সরষের তেলে ভেজে আলাদা পাত্রে রাখতে হবে। তারপর কড়াইয়ে পরিমাণমতো সরষের তেল ও একটু ঘি গরম করে নিতে হবে। তার মধ্যে শুকনো লংকা, সাদা জিরে, তেজপাতা আর ফোড়ন দিয়ে সেদ্ধ করা ডাল ঢেলে দিতে হবে। ঢালার ১০ মিনিট পরে ডাল ফুটে গেলে তাতে ভাজা বেগুন, ঘি, গরম মশলা আর স্বাদমতো চিনি দিতে হবে। সবার শেষে ভাজা কাঁচা লংকা বেঁটে ডালের মধ্যে দিয়ে ২ মিনিট পরে নামিয়ে নিতে হবে।

বৃতি সরকার, শিলিগুড়ি

ডুয়ার্সের ডিশ ক্রমেই যথেষ্ট জনপ্রিয় হচ্ছে তার প্রমাণ 'শ্রীমতী ডুয়ার্স'-এর মেল বক্স ছাড়াও রেসিপির ছড়াছড়ি মূল দপ্তরেও। যাঁরা বিবরণ লিখে পাঠাচ্ছেন তাঁদেরকে জানাই যেসব রান্না তরাই ডুয়ার্স এলাকায় সাবেকি পদ্ধতিতে হয়ে থাকে সেগুলিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। দয়া করে ভিনরাজ্যের বা ভিনদেশি প্রচলিত ডিশ লিখে পাঠাবেন না।

ডাব-চিংড়ি

উপকরণ: কচি ডাব (ভিতরে হালকা শাঁস)। ডাবের জলটা আলাদা করে রাখবেন। বড় চিংড়ি, পেঁয়াজ কুচি, সরষের তেল, সরষে বাটা, পেঁয়াজ-আদা এবং রশুন বাটা পরিমাণমতো, কাঁচা লংকা, হলুদ, নুন, চিনি, শুকনো লংকা গুঁড়ো, পোস্ত বাটা, চারমগজ বাটা পরিমাণমতো, আটা মাখা অল্প, টক দই।

প্রণালী: ডাবের মাথাটা ভাল করে কেটে নিন। দু'ইঞ্চি মাপের হলে ভাল। দেখবেন যেন ডাবের ভিতরে শাঁসটা ঠিক থাকে। চিংড়িগুলোকে হলুদ, নুন আর গুঁড়ো লংকা দিয়ে একটি পাত্রে মেখে রাখুন। কড়াইতে সরষের তেল দিয়ে মশলা মাখা চিংড়িগুলি মিনিট দুই হালকা ভেজে নিন। ওই তেলেই কুচোনো পেঁয়াজ ভেজে ফেলুন। একে একে রশুন, আদা বাটা আর পোস্ত বাটা দিয়ে হালকা করে নাড়তে থাকুন। এর পর কাঁচা লংকা বাটা, অল্প হলুদ, লংকা গুঁড়ো আর টক দই দিয়ে নাড়ুন। অল্প চারমগজ বাটাও দিতে পারেন। তারপর ডাবের জলে নুন ও চিনি মেশান। হালকা ভেজে রাখা চিংড়িগুলি এবার খুব ভাল করে মেশান মশলার মিশ্রণে। এর পর চিংড়িগুলি ডাবের ভিতরে ঢুকিয়ে মেখে রাখা আটার আস্তরণ দিয়ে ডাবের মুখটি বন্ধ করে দিন। এর পর প্রেশার কুকারে অর্ধেক জল দিয়ে ডাবটি রাখুন সাবধানে। প্রেশার কুকার মিনিট ১৫-২০ বন্ধ অবস্থায় আভেনে রাখতে হবে। নামিয়ে এনে ঢাকনা না খুলে রাখুন কয়েক মিনিট। তারপর কুকারের ঢাকনা খুলে ডাবটি বার করুন। ডাব-চিংড়ি তৈরি। গরম ভাত, লুচি, পোলাও— যার সঙ্গে খুশি পরিবেশন করুন।

পাপিয়া ঘোষ, গয়েরকাটা

Hotel Yubraj & Restaurant Monarch (Air Conditioned)

Room	Single	Double
Super deluxe (non AC)	Rs 600	800
Deluxe AC	Rs 900	1100
Super Deluxe AC	Rs 990	1200
VIP Deluxe AC	Rs1600	1600
Suite	Rs 3000	3000
Extra PAX (Non AC)	Rs 100	-
Extra PAX (AC)	Rs 200	-

NB tax As per Applicable

Charu Arcade, B. S. Road, Cooch Behar, (W.B.)
Tel: (03582) 227885 / 231710
email: hotelyubrajcoochbehar@gmail.com
www.hotelyubraj.com

নাগরিকদের উন্নত পরিষেবা দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মাথাভাঙা পৌরসভা

যেসব প্রকল্প চলছে—

- নদীর জল থেকে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করার সার্ভের কাজ করে দিল্লিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। ব্যয় হবে ৪০ কোটি টাকা। এর ফলে জলবাহিত রোগের সমস্যা দূর হবে।
- শীঘ্রই শুরু হবে মাথাভাঙা বাজারের আধুনিকীকরণের কাজ। ৬ কোটি টাকা দেবে রাজ্য সরকার।
- বাঁধ সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পে ১ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এতে বাঁধ বরাবর প্রায় ৩ কিমি পাকা রাস্তা, রাস্তার ধারে ফুলের বাগান, বাতিস্তম্ভ হবে। ১ ও ৫ নং ওয়ার্ডে দুটি বন দপ্তরের পার্ক হবে।
- চৌপথি ও শনি মন্দির এলাকায় দ্বিতল মার্কেট কমপ্লেক্স নির্মাণের টেন্ডার সম্পন্ন হয়েছে।
- ঐতিহ্যবাহী নৃপেন্দ্রনারায়ণ গ্রন্থাগার সংস্কারের কাজ চলছে।
- মালিবাগানে পুকুর সংস্কার করে বোটিংয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
- প্রাচীন শিব মন্দিরের সংস্কারের কাজ পুরোদমে চলছে।
- অর্ধসমাপ্ত আশুতোষ হলের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।
- কলেজ মোড়ে দুটি অথিতিশালা নির্মাণের কাজ চলছে।
- মাথাভাঙার নিকাশী ব্যবস্থা সুসংহত করতে মাস্টার প্ল্যান নেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের সহযোগিতায়।
- শহরের রাস্তা ও নিকাশী ব্যবস্থার সংস্কার হচ্ছে সারা বছরই।
- বিগত বোর্ডের কারণে এই পৌরসভার দায়ে থাকা প্রায় ২ কোটি টাকার ঋণ মেটানোর চেষ্টা চলছে। পানীয় জল সরবরাহের সমস্যা মেটাতে তিনটি নতুন পাম্প চালু করার চেষ্টা চলছে।
- দীর্ঘদিনের অনুন্নয়নে ভেঙে পড়া পৌর-ব্যবস্থাকে সীমিত সামর্থের মধ্যে উন্নত করার চেষ্টা চালাচ্ছে মাথাভাঙা পৌরসভা।

২০১৬ সালের কর্মসূচি—

- মাথাভাঙা পৌরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক জানান শহরে কনফারেন্স হল ও আর্ট গ্যালারি নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- শহরের ১২টি ওয়ার্ডে এলইডি পথবাতি লাগানো হবে, বরাদ্দ ৯০ লক্ষ টাকা।
- নগরবাসীর স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত করার লক্ষ্যে পৌরসভার পক্ষ থেকে এই প্রথম একজন স্থায়ী চিকিৎসক নিয়োগ করা হয়েছে। শহরের তিনটি সাব-সেন্টারে সপ্তাহে একদিন করে এবং পৌরসভার স্বাস্থ্য বিভাগে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে রোগি দেখবেন ডাক্তার অভিজিৎ সিনহা।
- এ ছাড়াও একজন স্যানিটারি ইনস্পেক্টর এবং একজন সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে।
- পৌরসভার ৭, ৮ ও ১২ নম্বর ওয়ার্ডে নিকাশী ব্যবস্থার সংস্কার ও নতুন পাকা ড্রেন নির্মাণ করা হবে।
- 'হাউজিং ফর অল' প্রকল্পে ৬৩টি পাকা ঘর নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ ছাড়া 'আরবান পুওর' প্রকল্পে ২৪টি ঘর নির্মাণ করে প্রাপকদের প্রদান করা হবে প্রাথমিক পর্যায়ে। খরচ হবে ২ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা।

চন্দন কুমার দাস
ভাইস চেয়ারম্যান,
মাথাভাঙা পৌরসভা

লক্ষপতি প্রামাণিক
চেয়ারম্যান
মাথাভাঙা পৌরসভা

কোলাইটিসে ভয়ের কিছু নেই

নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের পরেও পেটের নানারকম সমস্যা আজকাল ঘরে ঘরে। কিন্তু কেন? জীবনযাপনের রাশ শক্ত হাতে টেনেও কেন এত সমস্যা পেট নিয়ে? জানাচ্ছেন গ্যাস্ট্রো এনট্রোলজিস্ট।

আজকাল পেটের নানান সমস্যায় কাবু হতে দেখা যায় বাচ্চাদের। মাঝবয়সি থেকে শুরু করে বয়স্করাও বাদ যান না। দেখা যাচ্ছে, এ ক্ষেত্রে বেশির ভাগই অনেকদিন যাবৎ ভুগছেন কোলাইটিসে। প্রশ্ন হল, কোলাইটিস অসুখটা আসলে কী আর কেনই বা হয়? প্রাথমিকভাবে কোলাইটিস মানে বুঝি পেটব্যথা, বারবার পায়খানা যাওয়া, তার সঙ্গে আম পড়া। ডায়ারিয়ার মতো এই অবস্থাকে চিকিৎসার পরিভাষায় বলে, আইবিএস বা ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম। সাধারণভাবে এর কারণ হিসেবে আমরা টেনশনের কথা বলি।

কোলাইটিস অনেক রকমের হয়। কাদের বেশি হয় এবং কেনই বা এই প্রবণতা বেশি দেখা যায়? মহিলাদের এই অসুখটা বেশি হয়। যেহেতু অসুখটি টেনশনজনিত আর মহিলাদের টেনশনের প্রবণতা বেশি বলে তাদের মধ্যে অসুখটি বেশি দেখা যায়। বাড়ির যে কোনও একটি সমস্যায় স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই ইনভল্‌ভড; অথচ দেখা গেল, কোলাইটিসে আক্রান্ত হলেন স্ত্রী। আজকাল ছোটদের মধ্যেও কোলাইটিস সমস্যা দেখা যাচ্ছে। কারণ, পড়াশোনার চাপ যে হাড়ে বাড়ছে, তাতে তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ছে।

কোলাইটিস এমনিতে চিকিৎসার মাধ্যমে সারে ঠিকই, কিন্তু এটা আবার রিল্যাক্সও করতে পারে। তার মানে টেনশন মাত্রাতিরিক্ত হারে চলতে থাকলে অসুখ আবার ফিরে আসে। সে ক্ষেত্রে কিন্তু রোগীকে ওষুধের সাপোর্ট ছাড়াও যে পরিস্থিতির জন্য টেনশন তৈরি হয়েছে, তার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে।

কোলাইটিস রোগীরা বহু সময়েই বলেন, ওজন কমে যাচ্ছে। ইমিউনিটি পাওয়ারও কমছে। যে কোনও সিজনাল অসুখ সহজে আক্রমণ করছে ইত্যাদি। কিন্তু সব সময় কোলাইটিস এইসবের কারণ নয়। ওজন কমে যাওয়া বা ইমিউনিটি পাওয়ার কমার ব্যাপারে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে ভুলবেন না। তিনি আপনাকে সঠিক রাস্তায় গাইড করবেন। অনেকে বলেন, শরীরের ভিতরে কোনও জীবাণু দীর্ঘস্থায়ী হলে তো ক্যানসারের মতো অসুখ প্রোমোট করতে পারে। যেহেতু কোলাইটিস তাড়াতাড়ি সারে না বা সারলেও রিল্যাক্স করতে পারে— ফলে এই অসুখের জন্য কোলন ক্যানসার হতে পারে— এমন আশঙ্কাও করেন কেউ কেউ। কিন্তু জেনে রাখুন, কোলন ক্যানসারের সঙ্গে কোলাইটিসের কোনও সম্পর্ক নেই। এমন বহু কোলন ক্যানসার রোগী আছেন, যাঁদের কোলাইটিস নেই।

এবার বলি, কোলাইটিসে কী করবেন আর কী করবেন না। যেহেতু কোলাইটিস মূলত টেনশনের কারণে হয়ে থাকে, তাই টেনশন থেকে দূরে থাকাটা খুব জরুরি। যদিও আধুনিক জীবনে টেনশন আমাদের নিত্যসঙ্গী, তবু সেটা যেন এমন পর্যায়ে না পৌঁছায়, যাতে আপনার শরীর-স্বাস্থ্য বেহাল হতে পারে। তার মানে কোলাইটিসের অনেকটা ওষুধই আপনার হাতে।

কোলাইটিস রোগীর খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে বলি, এই অসুখের সঙ্গে খাবারের খুব বেশি রকমের সম্পর্ক নেই। তবে রুটি এবং দুধ— এই দুটো খাদ্য কিছুটা হলেও এড়িয়ে যাওয়াই ভাল। এই দু'টি খাদ্য থেকে অনেক সময় রোগের মাত্রা বাড়ে। আবার কারও যদি এই দু'টি খাদ্য সহ্য হয়ে যায়, তবে তিনি খেতে পারেন। তবে চল্লিশ বছর পেরনোর পর বাইরের খাবার যতটা সম্ভব এড়িয়ে যাওয়াই ভাল। কারণ এ কথা সত্যি যে, ওইসব খাবার মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর। কাজেই বাইরের খাবারদাবারের আকর্ষণ থেকে নিজেকে দূরে রাখাটা স্বাস্থ্য ও সুস্থ থাকার পক্ষে ভাল।

সবশেষে বলব, এই অসুখের জন্য রোগী কষ্ট পান ঠিকই। যেমন ডায়ারিয়া বা যখন খুব পেটব্যথা চলে, তখন স্কুল-কলেজ-অফিসে একটা অসুবিধার মধ্যেই পড়তে হয়। তার জন্য একটা মানসিক যন্ত্রণাও পেতে হয়। এই সময় এই বুঝি কী ভয়ংকর অসুখ আমাকে গ্রাস করল! কিন্তু মনে রাখবেন, কোলাইটিসে আক্রান্ত রোগী রোগকে নিয়ে যত ভাববেন, আসলে রোগটা মোটেও তত ভয়ংকর নয়। প্রথম থেকে রোগের চিকিৎসা করাতে পারলে বেশির ভাগ সময়ই সেরে যায়। তাই সাবধানে চলবেন, কোনওরকম ভয় পাবেন না।

ডাঃ অপূর্ব পাল

মিথ্যে অভিযোগ থেকে ছেলেকে বাঁচাতে চাই

মেঘ পিয়োন-এ মনের কথা শেয়ার করেছেন অনেকেই। আমাদের দপ্তরে পৌঁছানো কয়েকটি চিঠির মধ্যে থেকে আমরা বাছাই করা একটিমাত্র চিঠি এই সংখ্যায় প্রকাশ করলাম।

জীবনে এমন কিছু ঘটে, যা ভিতর থেকে মনকে নাড়িয়ে দেয়। আমার আদরের সন্তানকে তিল তিল করে বড় করে তোলার পর যখন বিনা দোষে তাকে শাস্তি পেতে দেখি, চোখের জলে ভাসতে দেখি, তখন একজন মা হিসেবে নিজেকে স্থির রাখা দায় হয়ে পড়ে। আমার ছেলে কলেজে পড়ছে তৃতীয় বর্ষে। লেখাপড়াতেও ভাল। তার এক বান্ধবী আছে, যার সঙ্গে তার কলেজেই প্রথম পরিচয়। আমার ছেলে তার কথা আমাকে সবই জানিয়েছিল। আচমকা একদিন এক ঘটনায় সব তোলপাড় হয়ে গেল এক নিমেষে। মেয়েটি হঠাৎ প্রেগন্যান্ট হয়ে পড়ে। এর পর তার বাবা-মা এবং পরিবারের অন্যান্যরা আমাদের বাড়িতে চড়াও হয় এবং আমার ছেলেকে ও আমাদের যাচ্ছেতাই বলে অপমান করে। আমি আমার ছেলের কাছ থেকে জানতে পারি, এর জন্য সে দায়ী নয়। ও যে আমাকে সত্যি কথাই বলছে, তাও বুঝতে আমার অসুবিধা হয়নি। তারপর আমার ছেলের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেও জানতে পারি যে, মেয়েটির ইদানীং অন্য একটি ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ঘটনাটা সম্ভবত তার সঙ্গেই ঘটেছে অথচ আমার ছেলে মাঝখান থেকে এভাবে জড়িয়ে যাওয়ায় আমি সাংঘাতিকভাবে ভেঙে পড়েছি। আমার ছেলেও বেঁকে বসেছে। বলছে, 'এমন প্রতারক মেয়েকে আমি বিয়ে করব না কখনওই।' এর পর জল কত দূর গড়াবে জানি না। আমি কী করব-না করব কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। আপনাদের পত্রিকায় 'মেঘপিয়োন' দেখে ভাবলাম যে, এখানে বললে হয়ত আমি নিজে একটু হালকা হব।

নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

'মেঘপিয়োন'-এ আপনারাও নিজেদের কথা শেয়ার করুন। লিখুন অনধিক ৭০০ শব্দে। পাঠান এই ঠিকানায়— **'শ্রীমতী ডুয়ার্স', প্রযত্নে- 'এখন ডুয়ার্স', মুক্তাভবন (দোতলা), মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১। ই-মেল করতে পারেন srimati.dooars@ gmail.com**

ওড়িশি নৃত্যশিল্পী মৌমিতা

ছোট্ট মৌমিতা মাত্র সাড়ে তিন বছরের। শখ করে নাচ শিখতে শুরু করল কুন্তলা রাহার কাছে। কত্থক নাচ। সে সময় অর্থাৎ গত শতাব্দীর আটের দশকের গোড়ায় জলপাইগুড়িতে কত্থক ছাড়া অন্য নাচের চল তেমন ছিল না। ফলে কত্থক ছাড়া আর কোনও নাচ শেখার সুযোগও ছিল না। ছোট্ট মৌমিতা ক্রমেই বড় হতে লাগল। পেরল বিশারদের গণ্ডি। তার শরীরী ভঙ্গিমায় ফুটে উঠল একজন দক্ষ নৃত্যশিল্পীর ছায়া। স্কুল পেরিয়ে কলেজ। মনের মধ্যে জমতে থাকে ওড়িশি নৃত্যের প্রতি আগ্রহ আর ভালবাসা। ততদিনে অনেকেই জলপাইগুড়িতে ভারতনাট্যম, ওড়িশি, মণিপুরি-সহ অন্যান্য নাচ শেখাতে শুরু করেছেন। মৌমিতা ওড়িশি শিখতে শুরু করল ঝিনুক চক্রবর্তীর কাছে। সেখানে মোনালিসা ঘোষের কাছেও তালিম নেওয়ার সুযোগ হল। কিন্তু মনের খিদে যতটা, ততটা যেন মিটছিল না। খোঁজ চলতেই লাগল। অবশেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল সুবিকাশ মুখোপাধ্যায়ের কাছে পৌঁছে। কলকাতায় গিয়ে তালিম নেওয়া শুরু হল। মনের ইচ্ছে এবার প্রায় পূর্ণ মাত্রা পেল। তবু বারে বারে তাঁর মনে হয়, শেখা সম্পূর্ণ হয়নি, শিখতে হবে আরও। সুবিকাশ মুখোপাধ্যায়ের 'সংকল্প নৃত্যায়ন'-এর জলপাইগুড়ি শাখা খোলার দায়িত্ব পড়ল মৌমিতার উপর। সানন্দে রাজি। ২০০৮ থেকে জলপাইগুড়িতে সাফল্যের সঙ্গে চলছে সেই শাখা মৌমিতা সেনগুপ্তর তত্ত্বাবধানে। হাসতে হাসতেই বললেন, 'আমার স্কুলে প্রথম শিক্ষার্থী ছিল মাত্র দু'জন। এখন ছাত্রীর সংখ্যা অনেক হলেও সেই দু'জন কিন্তু এখনও আছে এবং তারা শিখেও গিয়েছে।'

একই সঙ্গে তালিম দেওয়া ও নেওয়া। বার্ষিক অনুষ্ঠানে প্রথম দিকে মূল শাখা থেকে ছাত্রছাত্রীরা এসেছেন, এখন এখানকার শিক্ষার্থীরাই যথেষ্ট। মূল শাখার বার্ষিক অনুষ্ঠানে এখান থেকেই সকলে সেখানে অংশগ্রহণ করতে যায়। ২০১৫-র ২৯ মে একদিনের একটি উৎসব হয়ে গেল, যেখানে মণিপুরি নেচেছিলেন ইভানা সরকার, মধুরিমা গোস্বামী কত্থক, গুরু ও শিষ্যা নেচেছিলেন ওড়িশি। সাড়া ফেলেছিল শহরে।

নৃত্যশিল্পী হিসেবে নিজেও যেমন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন, তেমনি তাঁর ছাত্রছাত্রীদের প্রতিও রয়েছে সন্তানতুল্য ভালবাসা। সেই সঙ্গে অভিভাবকদের সঙ্গে বোঝাপড়ার ব্যাপারেও রয়েছে যথেষ্ট বিচক্ষণতা।

নৃত্যশিল্পী হিসেবে তাঁর আরও অনেক পথ চলা বাকি। এভাবেই তিনি এগিয়ে চলুন, তাঁর মতো করে। 'এখন ডুয়ার্স'-এর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি রইল আমাদের শুভেচ্ছা।

শ্বেতা সরখেল

সবলা মেলা মালবাজার

আর পাঁচজনের মতো নারীও স্বাবলম্বী ও স্বনির্ভর। তার নির্ভরতা ও অবলম্বনের পথ সে নিজেই খুঁজে নিয়েছে। এমন বহু নারীর একত্রিত হয়ে সক্রিয় উদ্যোগের উদাহরণ আজ সর্বত্র। তেমনই একটি হল জেলা সবলা মেলা। জেলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দপ্তর আয়োজিত 'সবলা মেলা ২০১৫' সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল মালবাজার বিডিও অফিস সংলগ্ন মাঠে। নারীমুক্তির আনন্দযজ্ঞ সবলা মেলায় আমন্ত্রিত ছিলেন মালবাজার তথা সারা জলপাইগুড়ি জেলার মানুষ। মেলার উদ্‌বোধন করেন জলপাইগুড়ির সাংসদ বিজয়কৃষ্ণ বর্মন। উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলাশাসক পৃথা সরকার, মালবাজারের মহকুমাশাসক জ্যোতির্ময় তাঁতি, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ভূষণ শেরপা, মালবাজার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কৌশল্যা রায় প্রমুখ। মেলায় প্রদীপ জ্বেলে, বেলুন উড়িয়ে নারীমুক্তি ও নারীশক্তির অন্তর্নিহিত বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়।

নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, তাদের উৎপাদিত পণ্যের ব্যবসায়িক লক্ষ্যে ৫০টি স্টল ছিল মেলায়। সেখানে বিপণনসামগ্রীর বিপুল সম্ভার প্রদর্শিত হয়। জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে আসা স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি উদ্যোক্তাদের তৈরি পণ্যের সমন্বয়ে স্টলগুলি সুসজ্জিত ছিল। মহিলাদের সৃজনীশক্তি ও শিল্পকলাকে তুলে ধরতে ও বিপণনব্যবস্থাকে উদ্দীপিত করতেই আয়োজিত হয়েছিল জেলা সবলা মেলা।

নারীর সামাজিক অবস্থান, প্রাত্যহিক সমস্যা, অগ্রগতির নানা অন্তরায়, অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা, শোষণ, অত্যাচার, এ ছাড়া ব্যাঙ্কিং, ঋণ, মা ও শিশুর টিকাকরণ ও রোগ নিরাময়ের মতো নানান বিষয় নিয়ে ছিল মধ্যাহ্নকালীন আলোচনাচক্র। অংশ নেন বিশিষ্টজন। নারী যে পাচারের পণ্য, ভোগদখল বা বিনা শর্তে অধিগ্রহণের মতো সম্পত্তি নয়, সে সম্পর্কেও মহিলা অংশগ্রহণকারীদের ছিল বিশেষ প্রতিবাদবার্তা। ছিল আনন্দধারা বা NRLM ও SVSKP নিয়ে বিতর্ক ও কুইজ অনুষ্ঠান। আর ছিল স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের মধ্যে শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, অঙ্ক কষে দৌড়, মিউজিক্যাল চেয়ার, ফুচকা খাওয়ার প্রতিযোগিতা। মধ্যাহ্নকালীন আলোচনা দিয়ে শুরু ও সমাপ্তির অঙ্গ ছিল মালবাজারের সোঁদামাটির গন্ধে মাতাল করা চা-বাগান অধ্যুষিত অঞ্চলের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ধামসা-মাদলের তালে ওড়িয়া ও নেপালি নৃত্য।

মেলাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে প্রতিদিন সান্ধ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সাজানো হত নাচ, গান, আবৃত্তি আর নাটক দিয়ে। উদ্দেশ্য, নারীর শ্রমসাধ্য কর্মে প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও তাকে সফল করা। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের যেমন পুরস্কৃত করা হয়, তেমনি পুরস্কৃত হয় সবচেয়ে বেশি বিক্রীত পণ্যের গোষ্ঠী ও উদ্যোক্তা। গতবারের তুলনায় এবার বিক্রীত পণ্যের পরিমাণ বেশি হওয়ায় বলা যায়, সবলার এই মিলনমেলার আয়োজন ও উদ্‌যাপন গ্রাম-শহরের মানুষের সঙ্গে মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মিলনের বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় ও সফল করবে।

মমতা পাল চন্দ, নারী উন্নয়ন আধিকারিক, মালবাজার

EKHON DUARS, Vol-2, Issue-11, WBBEN/2014/56733, Rs. 12 Only

ডুয়ার্সে এলিট সন্ধ্যা ৯-১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

চার্বাক প্রযোজনায়
নাটক
এখন তখন

ব্যবস্থাপনায়
এখন ডুয়ার্স

অভিনয়ে: সব্যসাচী চক্রবর্তী, খেয়ালি দস্তিদার, পরমা সরকার, অর্জুন চক্রবর্তী, গৌরব চক্রবর্তী, আদিত্য সেনগুপ্ত, খেয়া চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ
পরিচালনায়: অরিন্দম গঙ্গোপাধ্যায়

তারিখ	স্থান	প্রবেশপত্র প্রাপ্তিস্থান
৯ ফেব্রুয়ারি	কমিউনিটি হল, ফালাকাটা	এলিট শোরুম
১০ ফেব্রুয়ারি	রবীন্দ্র ভবন, কোচবিহার	এলিট শোরুম
১১ ফেব্রুয়ারি	আর্ট গ্যালারি, জলপাইগুড়ি	এখন ডুয়ার্স দপ্তর মুক্তা ভবন, মার্চেন্ট রোড

সঙ্গীতানুষ্ঠান
অন্তরা নন্দী
(জি সারেগামা লিটল চ্যাম্প ২০০৮)

Elite®
FOOTWEAR
পায়ে পায়ে আনন্দ

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 18/7 Dover Lane, Kolkata 700029, Editor - Pradosh Ranjan Saha.